পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত নূতন সিলেবাস অনুসারে
১৯৭৪ সালের **নবম শ্রেণীর** জন্য লিখিত।

ভারতের ইতিহাস

অধ্যক্ষ নির্মল মল্লিক চৌধুরী
মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ, উত্তর দমদম, বিরাটি।

দি গ্লোব লাইব্রেরী
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—
দি গ্লোব লাইব্রেরী
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩
পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪

মূল্য : ৬ টাকা ৭০ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা - ৬

ভূমিকা

নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নবম শ্রেণীর জন্য ভারতের ইতিহাস রচনা করা হইল। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ যে সময়ে পাঠ্যসূচী প্রকাশ করিাছেন এবং গ্রন্থখানি যে সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইল তাহার মধ্যে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বই লেখা একেবারেই অসম্ভব। তাহাছাড়া সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে এবারের পাঠ্যসূচী রচিত হইয়াছে। ফলে এই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী রচিত গ্রন্থগুলির সহিত পূর্বের গ্রন্থগুলির কোন মিল পাওয়া যাইবে না। এবারের পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস হইতে দক্ষিণভারতের ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তথাপি সুলতানি সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় যাহাতে পাওয়া সেই উদ্দেশ্যে পরিশিষ্টে বিজয়নগর ও বহমণী রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খুব অল্প সময়ে এই গ্রন্থখানি লিখিতে হইয়াছে। ফলে কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ঐগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে। আশা করি আমার পূর্বের গ্রন্থ "ভারতের ইতিহাস" যেভাবে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থখানিও সকলের নিকট তেমনি সমাদৃত হইবে।

বিনীত

১৫. ১২. ৭৩ **নির্মল মল্লিক চৌধুরী**

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
ভারতের ভৌগোলিক পরিচয়	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়		
ভারতের ইতিহাসের উপাদান	...	৮
তৃতীয় অধ্যায়		
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা	...	১৪
চতুর্থ অধ্যায়		
বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের অভ্যুদয়	...	২৫
পঞ্চম অধ্যায়		
বৈদেশিক আক্রমণ	...	৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়		
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগ, মগধের অভ্যুদয় : মৌর্য সাম্রাজ্য	...	৪৪
সপ্তম অধ্যায়		
প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি	...	৬৭
অষ্টম অধ্যায়		
ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি	...	৭৫
নবম অধ্যায়		
সুলতানি ও মুঘল শক্তির অভ্যুদয় ও পতন	...	৮১
দশম অধ্যায়		
ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব	...	১১৮
একাদশ অধ্যায়		
মারাঠা ও শিখজাতি	...	১৩৪
দ্বাদশ অধ্যায়		
ইউরোপীয়দের আগমন : ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ	...	১৪৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়		
ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তার	...	১৫৫
চতুর্দশ অধ্যায়		
সংস্কার : সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন	...	১৬৯
পঞ্চদশ অধ্যায়		
ভারতীয় বিদ্রোহ	...	১৮০

3404

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ভৌগোলিক পরিচয়

মানুষ ও তাহার পরিবেশ (Man and his environment): মানুষের কার্যকলাপ ও মানব সভ্যতার বিবরণী ও বিশ্লেষণের নাম ইতিহাস। মানুষ ও পরিবেশ ইহা হইল ইতিহাসের দুইটি-মূলবস্তু। মানুষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষও পরিবেশের সৃষ্টি। সুতরাং মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়।

ভূগোল (Geography): পরিবেশের মৌলিক উপাদান হইল ভূগোল। কোন বিশেষ ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়াই সেই স্থানের পরিবেশ গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের স্বভাব, চরিত্র ও জীবনযাত্রা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরণের। বিভিন্নদেশের মানুষের পোষাক, পরিচ্ছদ, ভাষা ও খাদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ আলাদা।

পরিবেশের মৌলিক উপাদান ভূগোল

জাতীয় জীবন গঠনে ভূগোল ও পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। ভারতের জাতীয় জীবনও ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical features of India): ভারত একটি বিশাল দেশ। একটি উপ-মহাদেশ বলা যাইতে পারে। বিশালতায় ইহা রাশিয়া বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমতুল্য। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এশিয়ার অন্যান্য অংশ হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ইহা ব্যতীত পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে আফগানিস্থান ভারতের সীমান্ত স্পর্শ করিয়াছে।

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ: ভারতকে মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত অঞ্চলকে **আর্যাবর্ত** ও বিন্ধ্যপর্বত হইতে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চলকে **দাক্ষিণাত্য** বা **দক্ষিণাপথ** বলা হয়। আর্যাবর্তকে তিনটি ভাগে এবং দাক্ষিণাত্যকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়।

আর্যাবর্তের তিনটি ভৌগোলিক বিভাগ :—

(১) পর্বতশ্রয়িণ বা হিমালয় অঞ্চল, (২) উত্তর ভারতের সমতলভূমি, (৩) মধ্য ভারতের সমতলভূমি।

দাক্ষিণাত্যের দুইটি ভৌগোলিক বিভাগ হইল :—

(১) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল ; (২) সমুদ্রোপকূলবর্তী দীর্ঘ এবং অপরিসর সমভূমি ;

ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব (Influence of Geography on Indian History) ; ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করিয়াছে। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল হইতে বিছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ের গিরিপথগুলি দিয়া বৈদেশিক জাতিগুলি বারংবার ভারত আক্রমণ করিয়াছে এবং এই গিরিপথ দিয়াই তীর্থযাত্রী, বণিক এবং পরিব্রাজকগণ ভারতে যাতায়াত করিত। হিমালয় হইতে নিঃসৃত নদীগুলি উত্তর ভারতকে শস্যশ্যামলা করিয়াছে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও রণনিপুণ জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং দুর্ধর্ষ বৈদেশিক জাতিগুলির আক্রমণে বাধা প্রদান করিয়াছে।

হিমালয়ের প্রভাব

ভারতের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যপর্বত অবস্থান করিয়া উত্তর ভারতকে দক্ষিণ ভারত হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে প্রাচীন কালে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে বাধা সৃষ্টি হইয়াছিল। উত্তর ভারত হইতে আর্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত দ্রাবিড়গণ দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বিন্ধ্যপর্বতের প্রভাব

পর্বত ও সমুদ্রবেষ্টিত ভারত অপরাপর দেশ হইতে মূলতঃ বিচ্ছিন্ন। এইজন্য ভারতে সুপ্রাচীন কাল হইতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা গঠিয়া উঠিয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়া নদনদী প্রবাহিত হইয়া ভারতের সমতল ভূমিকে সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা করিয়াছে। ভারত খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ফলে ভারতে কল-কারখানা ও শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিচিত্র, মনোরম ও রমনীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জ্ঞানচর্চার অনুকূল। ফলে কাব্য, দর্শন, গণিত, সাহিত্য প্রভৃতিতে ভারতীয়গণ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল।

বিভিন্ন সম্পদে সমৃদ্ধ
জ্ঞানচর্চা

ভারত পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রের দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলেও বর্হিজগতের সহিত ভারতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর্যগণ হইতে স্থরু করিয়া গ্রীক, পারসিক, শক, হূণ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং ক্রমে ভারতের জনগণের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

বহুজাতির মিলন ক্ষেত্র

ভারতের উপকূলে প্রাচীন কালে বহু বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল বন্দর হইতে বণিকগণ চীন, রোম, কম্বোজ, চম্পা, স্থমাত্রা, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। এই সকল বণিকদের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা, দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতীয় বণিকগণ বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। ফলে কাসগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

প্রকৃতির প্রভাব ভারতের ইতিহাসে যেমন শুভ হইয়াছে তেমনি অশুভও হইয়াছে। ভারতের ঐশ্বর্য ও সম্পদের লোভে বৈদেশিক জাতিগুলি বারংবার ভারত আক্রমণ করিয়াছে এবং ভারতের জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রায় বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। ভূমি ও জলবায়ু সহজ জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়ক থাকায় প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। এইজন্য ভারতীয়গণ পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চার দিকে গুরুত্ব আরোপ করে নাই। ভারতের অভ্যন্তরে বহু নদনদী ও পাহাড় থাকায় বহু পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অনৈক্যের জন্য ভারতীয় নৃপতিগণ বৈদেশিক আক্রমণের গতিরোধ করিতে পারেন নাই।

বৈদেশিক আক্রমণ

পদার্থ বিজ্ঞান চর্চার অভাব

রাজনৈতিক অনৈক্য

ভারতের কোনও অঞ্চল পর্বতময় বন্ধুর, কোথাও বিশাল মরুভূমি, আবার কোথাও সমতলভূমি। এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। ফলে তাহারা সাহসী এবং রণনিপুণ। সমতলভূমির অধিবাসীরা সহজে জীবিকা অর্জন করিতে পারে, এইজন্য তাহারা কম পরিশ্রমী।

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য

ভারতের অধিবাসী (Elements of India's Population) ঃ দৈহিক গঠন, ভাষা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতের অধিবাসিগণকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বিরজা শংকর গুহ ভারতের জনসাধারণকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ছয়টি ভাগ হইল ঃ

(১) **নিগ্রিটো (Negrito) ঃ** ইহাদের রং কালো, নাক চ্যাপ্টা, বেটে, চুল পশমের মত। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, আসামের আঙ্গামী নাগা এবং দক্ষিণ ভারতের ইরুল্বা, কুরুম্বা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নিগ্রিটো জাতির বংশধর দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) **প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Austroloid) ঃ** অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত এই শ্রেণীর লোকের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সিংহলেও এই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) **মোঙ্গলইড (Mongoloid) ঃ** সিকিম, ভুটান এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এই জাতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) **মেডিটেরেনিয়ান (Mediterranean) ঃ** সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতনা এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের বসবাস। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(৫) **ওয়েস্টার্ণ-ব্রাকিসেফেলাস (Western-Brachycephallous) ঃ** বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, গঙ্গা-উপত্যকা, উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ, দক্ষিণভারতে কানাডা, তামিল, উত্তর-পশ্চিম ভারতের চিত্রল ও গিলগিট অঞ্চলে এই জাতির লোকের বাস।

(৬) **নর্ডিক বা আর্য (Nordic or Aryan) ঃ** প্রাচীন আর্যজাতির বংশধরগণ হইল এই শ্রেণীভুক্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারত, রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রে ইহারা বসবাস করে।

সমন্বয়ী সংস্কৃতির অভ্যুদয় (Evolution of a Composite Culture) ঃ ভারত একটি সুবিশাল দেশ। সুপ্রাচীনকালে ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণ পরিবেশের প্রভাবে স্বকীয় পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিত। ক্রমাগত বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির ভারতে আগমনের ফলে তাহাদের সহিত ভারতের আদিম জাতিগুলির রক্তে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আবার কোথাও

বা আদিম জাতিগুলি গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতিকে বজায় রাখিয়াছে। আর্যদের আগমনের ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের ফলে ভারতের জীবনধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। মৌর্যযুগ হইতে ভারতে গ্রীক্, শক, হুণ, কুষাণ, গুর্জর প্রভৃতি যে সকল বিদেশী জাতি প্রবেশ করে তাহারা ক্রমে ক্রমে ভারতের জনগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণের ভারতে আগমনের পর হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হইল। তুর্ক-আফগান ও মুসলমানগণের সহিত ভারতের হিন্দু অধিবাসীদের মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও তাহারা ভারতকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। মুসলমান সম্রাট ও সুলতানগণ একাধিক হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে হিন্দু সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার মুসলিম রাজ-অন্তঃপুরে সহজ ভাবেই প্রবেশ করিয়াছিল।

সংস্কৃতির সমন্বয়

রক্ষণশীল হিন্দুদের বাধাদান সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন ও সমন্বয়ের ধারা মুসলিম যুগের সূচনা হইতেই প্রবাহিত হইতেছিল। ভারতের বহু হিন্দু অধিবাসী হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে এই সকল ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ মুসলিম সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ পূর্বের ন্যায় নিজেদের পেশা অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করিত। ফলে মুসলিম সমাজেও কয়েকটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইল। এই মুসলমান যুগেই পাঞ্জাবে **গুরু নানক,** মধ্যভারতে **কবীর**, মহারাষ্ট্রে **নামদেব** নূতন ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। গুরু নানকের প্রচারিত শিখধর্ম পাঞ্জাবে শিখজাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। কবীর ভক্তিমূলক ধর্মপ্রচার করেন। বাংলাদেশে **শ্রীচৈতন্যদেব** বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার প্রেম ও ভক্তিমূলক এই ধর্ম বাংলাদেশে এক নূতন জীবনধারার প্রবর্তন করে। হিন্দু-মুসলিম সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হইবার ফলে উভয় ধর্মাবলম্বীদের উপাস্য সত্যপীর, মুস্কিল-আসান, ত্রিলোকপীর প্রভৃতি নূতন দেবতার আবির্ভাব হইল। মারাত্মক রোগের উপশমের জন্য মুসলমানগণ হিন্দু দেবদেবীর নিকট পূজা দিতে লাগিল। উত্তর ভারতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমান পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানে অভ্যস্ত হইয়া গেল। ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিল। ধর্মের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও দুইটি বিভিন্ন ধর্মের অধিবাসিগণ এক সমন্বয়ী জীবনধারার সৃষ্টি করিল।

নানক, কবীর, চৈতন্যদেব

আগমনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্যের ছাপ পড়িল। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কাঠামো ঠিক রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে ভারতে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাঃ ভারতীয় সভ্যতার মূলগত ঐক্য ("Unity in diversity" ঃ Fundamental unity) ঃ ভারত এক বৈচিত্র্যময় দেশ। জাতি, ধর্ম, ভাষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সকল দিক হইতেই ভারতের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া ভিনসেণ্ট স্মিথ ভারতকে "নৃতত্ত্বের যাদুঘর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। ভারতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম বিদ্যমান। আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও রীতি-নীতিরও বিভিন্নতা রহিয়াছে। এই সকল বৈচিত্র্যের জন্য ভারতে কখনও রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠে নাই।

বৈচিত্র্য

কিন্তু এই বৈচিত্র্যের অন্তরালেই একটি ঐক্যের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এক ভারত গঠনের আদর্শ ভারতের জনসাধারণের নিকট নূতন নহে। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও বহু প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশ "ভারতবর্ষ" এই একটি মাত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে; "রাজচক্রবর্তী" বা "সম্রাট" এই আদর্শ ভারতের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান। এইজন্য অধিকতর শক্তিশালী নৃপতিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত রাজা সুদাসের সহিত "দশ রাজার যুদ্ধ" এবং সুদাসের জয়লাভ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং "সম্রাট", "রাজাধিরাজ", "একরাট", "অধিরাজ" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ এবং রাজসূয় ও "বাজপেয়" প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, প্রাচীন ভারতে একচ্ছত্র শাসন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক ঐক্য লাভের প্রচেষ্টার সাক্ষ্য প্রদান করে। এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া মহাপদ্ম নন্দ ভারতে প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি ভারতের প্রথম সম্রাট।

ঐক্যের আদর্শ

রাজনৈতিক ঐক্য প্রচেষ্টা

সমগ্র ভারতে একটিমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মৌর্য, গুপ্ত ও মুঘল সম্রাটগণের প্রচেষ্টা কখনও সাফল্যলাভ করে নাই। একমাত্র ব্রিটিশ যুগেই ভারত একটিমাত্র অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

রাজনৈতিক ঐক্য ব্যতীত ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য লক্ষ্যণীয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় এবং বিভেদের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এবং ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল হইতে সিন্ধুনদের পশ্চিমদিক পর্যন্ত অঞ্চলকে ভারতের রাজন্যবর্গ ও মুনি-ঋষিগণ একটিমাত্র ভূখণ্ড হিসাবে কল্পনা করিতেন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি মাত্র ভাষা বহুল প্রচলিত ছিল। ইহা হইল "প্রাকৃত" ভাষা। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে সংস্কৃত ভারতের জনসাধারণের ভাষারূপে পরিগণিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত এই প্রাচীন দুই মহাকাব্য হিন্দুগণ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন। বেদ, পুরাণ ভারতের বিভিন্ন অংশের হিন্দুদের ধর্মপুস্তক।

সাংস্কৃতিক ঐক্য

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তীর্থস্থানগুলি ভারতের জনসাধারণের মিলনক্ষেত্র। শ্রীচৈতন্য, শংকরাচার্য প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণের প্রচারের ফলে ধর্মীয় ঐক্যবোধ জাগরিত হইয়াছিল। এই ধর্মীয় ঐক্যবোধ সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধকে আরও সুদৃঢ় করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বাহিরে যে জনসাধারণ তাহারও হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। অল্-বিরুণী এবং তাঁহার পর হইতে মুসলিম ধর্মের বহু মনীষী হিন্দুদের ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রামাঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুদের আচার-ব্যবহার প্রবেশলাভ করিয়াছে। মুসলমানদের আগমনের ফলে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। উভয় ধর্মাবলম্বীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীতে ভারতকে বিভক্ত করিয়া যে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছে তাহা বৈদেশিক ব্রিটিশ সরকারের বিভেদনীতির ফল। অতি সম্প্রতি পাকিস্তান বিভক্ত হইয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিভেদ সত্ত্বেও এই তিনটি রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রহিয়াছে। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের ইতিহাসের উপাদান

(Sources of Indian History)

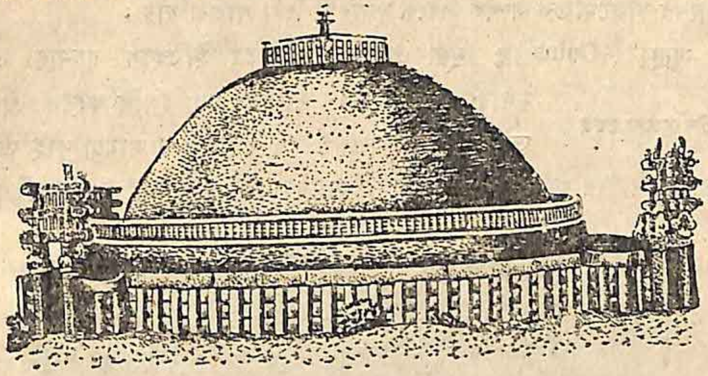
একাদশ শতাব্দীতে যখন অল্-বিরুণী ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "হিন্দুরা ইতিহাস রচনা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।" পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ফ্লিটও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "সত্যিকার ইতিহাস রচনা সম্পর্কে হিন্দুদের কোনরূপ ধারণা ছিল কিনা সন্দেহ।" বাস্তবিক প্রাচীন ভারতের কোনরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। এইজন্য প্রাচীন ভারতের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করিতে হইলে আমাদের কয়েকটি শ্রেণীর উপাদানের উপর নির্ভর করিতে হয়। (১) প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, (২) লিপি, (৩) মুদ্রা ও শীলমোহর, (৪) কীর্তিস্তম্ভ ও স্মৃতিসৌধ, (৫) ধর্মীয় সাহিত্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক সাহিত্যসমূহ ও (৬) বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার (Archaeological Excavations) ঃ খননকার্যের ফলে ভূগর্ভ হইতে যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই হইল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার খননকার্যের ফলে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের এক সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এই সভ্যতার সন্ধান পান। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শাল দীর্ঘকাল এই খননকার্য পরিচালনা করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ফলে সাঁচীতে একটি বৌদ্ধ স্তূপ, নালান্দায় বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাঁচী ভূপালে ভিল্‌সার নিকট অবস্থিত। বৃত্তাকার রেলিং-এ ঘেরা বৌদ্ধ স্তূপ, রেলিং-এর মাঝে উন্নত তোরণ, ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্প প্রতিভার এক অনবদ্য নিদর্শন। নালন্দা বর্তমান পাটনা জেলার বড়গাঁও নামক স্থানে। এখানে যে বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে পাঠকক্ষ বিদ্যার্থীদের শয়নকক্ষ এবং সমাবর্তন সভার হলঘর আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

মহেঞ্জোদাড়ো, সাঁচী, নালন্দা

লিপি (Inscriptions) ঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় লিপি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লিপি হইতে আমরা অনেক ঘটনা

ও ঐ সকল ঘটনার তারিখ নির্ণয়ে সক্ষম হই। লিপি সাধারণত চার প্রকারের—রাজ-প্রশস্তি, শাসন ও ধর্ম সংক্রান্ত, দানপত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনা সংক্রান্ত।



সাঁচী স্তূপ

যেমন :—সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি, রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপি এবং



অশোকের শিলালিপি

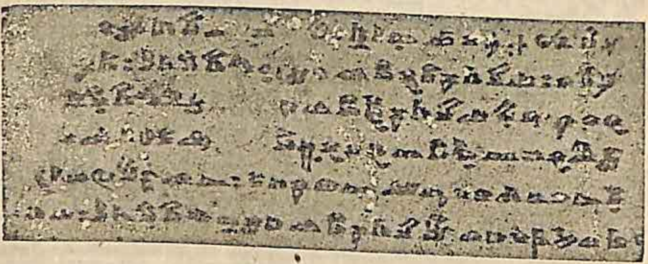
কলিঙ্গরাজ খারবেলার 'হাতীগুম্ফা-শিলালিপি'। সম্রাট অশোকের শিলালিপি এবং স্তম্ভলিপি হইতে তাঁহার শাসন এবং ধর্ম বিষয়ক বহু তথ্য জানা যায়। অনেক বিদেশী লিপি হইতেও ভারতের ইতিহাস রচনার বহু উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত

লিপির গুরুত্ব

বোঘাজ-কোই লিপি হইতে ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যদের বিস্তার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। নকৃসি-রুস্তমে লিপি হইতে ভারতের সহিত ইরাণের রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব

মুদ্রা (Coins) ঃ মুদ্রা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার একটি মূল্যবান উপাদান। সাহিত্য বা লিপি হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যে সকল তথ্য আমরা পাই তাহার সত্যতা নিরুপণ করিতে মুদ্রা সাহায্য করে। বিভিন্ন ঘটনার তারিখ নির্ণয়েও



খোটানে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথি (সংস্কৃতে লেখা)

মুদ্রা একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান। শক, ব্যাক্ট্রিয় এবং পার্থিয় শাসকগণের ইতিহাস বিশেষভাবে মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

কীর্তিস্তম্ভ ও স্মৃতিসৌধ (Monuments) ঃ স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং শিল্পের উৎকর্ষতার নিদর্শন হইল এই সকল স্মৃতিসৌধ ও কীতিস্তম্ভগুলি। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন নগরের যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সৌধ ও অট্টালিকা সমূহের স্তরবিন্যাস পরীক্ষা করিয়া উহাদের নির্মাণকাল নির্ণয় করা হইয়া থাকে। তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপরও স্তম্ভ ও সৌধগুলি যথেষ্ট আলোকসম্পাত করে।

ধর্মীয় সাহিত্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক সাহিত্যসমূহ (Religious Literatures and Contemporary Historical literatures) ঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আর একটি মূল্যবান উপাদান হইল প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং ঐতিহাসিক সাহিত্যসমূহ। বৈদিক সাহিত্য হইতে আর্যগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মগ্রন্থ-সমূহ হইতে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন কি গার্গী সংহিতার ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্র এবং

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, জ্যোতিষশাস্ত্র ও ব্যাকরণ

পাণিনী রচিত অষ্টাধ্যায়ী এবং পতঞ্জলি রচিত মহাভাষ্য প্রভৃতি ব্যাকরণ হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। বংশাবলী, রামায়ণ এবং মহাভারত, পুরাণ হইতেও আমরা ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান পাই।

মহাভারত ও পুরাণ বংশাবলী, রামায়ণ,

দ্বাদশ শতাব্দীতে কল্হণ রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সোমেশ্বর রচিত 'রাসমালা' এবং 'কীর্তিকৌমুদী' এবং রাজশেখর রচিত 'প্রবন্ধকোষ', বানভট্ট চরিত 'হর্ষচরিত', বিল্হণ রচিত 'বিক্রমাংকদেব চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত', পদ্মগুপ্ত রচিত 'নবসাহসাঙ্কচরিত', বাকপতি রচিত 'গৌড়বহ' এবং হেমচন্দ্রের রচিত 'কুমার পাল চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়।

সাহিত্য ও নাটক

বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিদেশী পর্যটক এবং লেখকগণের বিবরণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ভারতে না আসিয়াও পারস্য কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কুইনটাস কার্টিয়াস, আরিয়ান, ডিয়োডোরাস এবং প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রন্থকারদের রচনায় আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ হইতে মৌর্যযুগের ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান বিবরণ পাওয়া যায়। 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতের অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে এক মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। টলেমি ও প্লিনির বিবরণীও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মৌর্যোত্তর যুগে শক, পার্থিয় এবং কুষাণদের বিস্তার সম্পর্কে চৈনিক গ্রন্থকারদের বিবরণী অপরিহার্য। ফা-হিয়েন হিউয়েন সাঙ্, ইট-সিঙ, মা-হুয়াঙ এবং ফেসিঙ এবং সু-মা-কিয়েন-এর গ্রন্থে ভারত সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ তাঁহার বিবরণীতে ভারত সম্পর্কে বহুবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন যুগের অবসানের পূর্বে যে সকল মুসলমান গ্রন্থকার ও পর্যটক আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভারত সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতে ইহাদের মধ্যে অল্-বিরুণী, অল্-বিলাদুরী, সুলেমান, হাসান নিজামী, অল্-মাসুদী এবং ইবন-উল্-আথির-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক বিবরণী

চৈনিক পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণ

মুসলমান পর্যটকদের বিবরণী

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের উপাদান (**Sources of Medieval Indian History**)**ঃ** (১) **সরকারী দলিলপত্র ঃ** মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। মুসলিম শাসকগণ সরকারী কাগজ, দলিল, ফারমান, নথিপত্র সযত্নে রাখিয়া দিতেন। এই সকল নথিপত্র হইতে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান পাওয়া যায়।

(২) **সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা ঃ** তুর্ক-আফগান যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে মধ্যযুগের ভারতের এক প্রামাণ্য চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মিনহাজ্‌উদ্দিনের 'তবাকৎ-ই-নাশিরী' হইতে দিল্লীর দাসবংশের (১৭৬৭ খৃঃ পর্যন্ত) ইতিহাস পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন বারণী রচিত 'তারিক-ই-ফিরুজশাহী' গ্রন্থে দিল্লীর তুর্ক-আফগান সুলতানদের বিবরণী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ফিরোজশাহ্‌ তুঘলকের নিজের রচিত 'ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে তাঁহার রাজত্বকালের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী' এবং হুমায়ুনের দেহরক্ষী ও অনুচর জউহর-এর রচিত 'তাজকিরাত-উল্‌-ওয়াকিয়াত', হুমায়ুনের ভগিনী গুলবদন বেগমের রচিত 'হুমায়ুন-নামা', আব্বাস শেরওয়ানী প্রণীত 'তারিখ-ই-শেরশাহী', আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'আকবরনামা', বদাউনী রচিত 'মুনতাখাব-উল্‌-তাওয়ারিখ' এবং জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। আবুল হামিদ লাহোরী রচিত 'বাদশাহ্‌নামা' এবং আর একখানি গ্রন্থ 'আলমগীর নামা' হইতে শাহজাহান এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অনেক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থগুলি ব্যতীত কাফীখানের 'মুনতাখাব-উল্‌-লুব্বব', ফেরিস্তার 'তারিখ-ই-হিন্দুস্থান মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার জন্য অপরিহার্য।

বারণী

সাহিত্য, ইতিহাস, আত্মজীবনী

আবুল ফজল, বদাউনী

ফেরিস্তা, কাফীখান

(৩) **মুদ্রা সৌধ এবং কীর্তিস্তম্ভসমূহ ঃ** সুলতানি যুগ ও মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার জন্য মুদ্রা, সৌধ, কীর্তিস্তম্ভ ও স্মৃতিসৌধসমূহ হইতে অনেক উপাদান পাওয়া যায়। দিল্লীর কুতুবমিনার, সাসারামে শেরশাহের সমাধি, জুম্মা মসজিদ, ফতেপুর সিক্রি, তাজমহল, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি এবং এই ধরনের অসংখ্য সৌধ, কীর্তিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ মুসলমান যুগের শিল্প, ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

কুতুবমিনার, তাজমহল

(৪) **সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থ ও ভ্রমণ কাহিনী ঃ** মুসলিম যুগে রচিত বৈষ্ণবপদাবলী, কবীরের দোহা, মুসলিম স্থফী সাহিত্য, শিখদের গ্রন্থসাহেব, নানকের জপজী, মীরাবাঈ-এর ভজন, তুলসীদাসের রামচরিতমানস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থসমূহ সমসাময়িক সমাজ ও ধর্মের উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করে।

ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত

যে সকল বৈদেশিক পর্যটক ও রাজদূত এই যুগে ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইবন বতুতা, রালফ্ ফিচ্, স্যার টমাস রো, হকিন্স, বার্ণিয়ের, টেভার্নিয়ের প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বিবরণীতে ভারত সম্পর্কে অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

(৫) **হিন্দু লেখকদের রচনা ঃ** হিন্দু লেখকদের রচনা হইতে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে জনৈক মারাঠা গ্রন্থকার রচিত 'সভাসদ বাখার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুত জাতির বীরত্ব ও শৌর্যকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে চারণ কবিদের রচিত কবিতা ও গাঁথা।

আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাসের উপাদান (Sources of Modern Indian History) ঃ (১) **সরকারী কাগজপত্র ঃ** আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত কম শ্রমসাধ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে সরকারী কাগজপত্র এবং স্মারকলিপিসমূহ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। দিল্লীতে অবস্থিত 'জাতীয় সংগ্রহশালা' এবং মাদ্রাজ, বম্বে, পুনা এবং কলিকাতার

সরকারী দলিল ও নথিপত্র

'রেকর্ড অফিস' সমূহে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দলিল, কাগজ ও নথিপত্র রক্ষিত আছে। লণ্ডনে অবস্থিত 'কমনওয়েলথ রিলেসন্স অফিসে', লিসবন এবং নোভাগোয়ায় অবস্থিত পর্তুগীজ সংগ্রহশালা, ওলন্দাজদের সরকারী সংগ্রহশালায় এবং পণ্ডিচেরীতে রক্ষিত ফরাসীদের সরকারী কাগজপত্র ও দলিলসমূহ হইতে ভারতের ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান পাওয়া যায়।

(২) **বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ঃ** ফার্সী ভাষায় রচিত 'সিয়ুর-উল্-মুতাক হারিন', সরদেশাই সম্পাদিত ও ইংরেজীতে অনূদিত 'পেশোয়ার গুরুত্বপূর্ণ

সরদেশাই, আনন্দ পিল্লাই ও ডুপ্লের গ্রন্থ

কাগজপত্র', তামিল ভাষায় লেখা আনন্দরঙ্গ পিল্লাইয়ের ডায়েরী, ডুপ্লের রচিত 'হুবাস', আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ। মিল্-এর রচিত ভারতের ইতিহাস, গ্রাণ্ট ডাফের রচিত মারাঠা ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা

(Antiquity of India and her Civilisation)

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা (The Indus Valley Civilisation) ঃ সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলার মহেঞ্জোদাড়ো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলার হরপ্পায় খননকার্যের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রায় ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় এক উন্নত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্যার জন মার্শালের মতে

সিন্ধু সভ্যতার কাল

খৃঃ পূঃ ৩২৫০ হইতে খৃঃ পূঃ ২৭৫০ অব্দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়োয় একটি স্তূপ দেখিয়া বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ মনে করিয়া খননকার্য আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ঐ বৎসর দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় একই ধরনের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে ব্যাপক খননকার্য আরম্ভ করা হয় এবং উভয় স্থানে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

উভয়স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিসপত্র, ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ হইতে সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এখানে যে সকল

শীলমোহরে খোদাই করা লিপির ভাষা

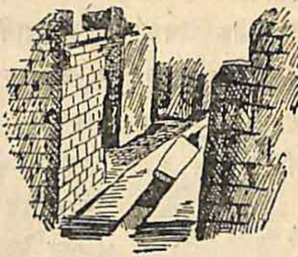
শীলমোহর ও পাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে খোদাই করা অক্ষরগুলি পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নাই। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা এক চিত্রলিপি ব্যবহার করিত যাহার সহিত মিশরের হিয়ারোগ্লিফিক এবং স্থমের'এর কিউনিফর্ম লিপির সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

সিন্ধু সভ্যতার রূপ (Nature of the Indus Civilisation) ঃ সিন্ধু উপত্যকায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা

নগরবিন্যাস

ছিল নগরকেন্দ্রিক। নগরে সামান্য কুটির হইতে সুরম্য অট্টালিকা পর্যন্ত শোভা পাইত। অট্টালিকাগুলি পোড়া ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। নগরের মধ্যে বহু প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত রাজপথ ছিল।

রাজপথের উভয় পার্শ্বে গৃহগুলি নির্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি গৃহ উদ্যানসংলগ্ন ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ময়লা জল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত নর্দমা ছিল। বাসগৃহ ছাড়া আরও এক শ্রেণীর বৃহদায়তন অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি সম্ভবতঃ প্রাসাদ বা পৌর সভার অধিবেশন কক্ষ ছিল।



মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত নর্দমা

একটি বৃহৎ স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার পরিধি প্রায় ১১,৪৪০ বর্গ-ফুট। এই স্নানাগারের মধ্যে সাঁতার কাটিবার উপযোগী জলাশয় ছিল, যাহা ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর। ইহার চারিপাশে বসিবার গ্যালারি ছিল। স্নানাগারটি প্রস্তর-বেষ্টিত ছিল এবং ইহার চারিদিকে অনেকগুলি কক্ষ ছিল।

বৃহৎ স্নানাগার

অধিবাসীদের খাদ্যের মধ্যে গম, যব, দুগ্ধ এবং ফলই ছিল প্রধান। মাছ এবং মাংসও ইহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ, হাতী, ভেড়া, শূকর ও মোরগ উল্লেখযোগ্য। কুকুরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; ঘোড়ার কিন্তু প্রচলন ছিল না। মহেঞ্জোদাড়োর অধিবাসিগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, সীসা এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত জিনিস ব্যবহার করিত। ইহারা লৌহের ব্যবহার জানিত না। ছুরি, বঁড়শি, কাস্তে, কুঠার, বর্শা, গদা প্রভৃতি ব্রোঞ্জ এবং তাম্র দ্বারা প্রস্তুত হইত। রাজপুতানা এবং কাথিওয়াড় হইতে পাথর আমদানি করা হইত। ছুরি, শীলমোহর, মূর্তি, ছোট পাত্র এবং অলংকার নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ধরণের পাথর ব্যবহার করা হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হস্তিদন্ত এবং মূল্যবান পাথর দ্বারা গহনা তৈয়ারি করা হইত।

খাদ্য ও গৃহপালিত পশু

ধাতুর ব্যবহার



হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহর

মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় যে সকল মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার উপরিভাগ খুব মসৃণ এবং নানা চিত্রশোভিত। যে সকল সুন্দর সুন্দর গহনা, তৈজসপত্র এবং মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে সিন্ধু উপত্যকার

অধিবাসীদের উন্নত শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহর ও পাথরের মূর্তির গায়ে যে সকল পশু-পক্ষীর সুন্দর মূর্তি অংকিত দেখা গিয়াছে তাহা সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের উন্নত শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন।

ধর্ম

মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার অধিবাসীদের ধর্ম কি ছিল তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। সম্ভবতঃ কোন মন্দির ছিল না। স্ত্রী-মূর্তির আধিক্য দেখিয়া মনে হয় মাতৃপূজার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কতকগুলি শীলমোহরে অংকিত শিংযুক্ত ত্রিমূর্তি পুরুষের প্রতিচ্ছবিও পাওয়া গিয়াছে। উহা শিবমূর্তি বা শিবলিঙ্গের অনুরূপ। ইহার চারিপাশে জীবজন্তুর ছবি অংকিত রহিয়াছে। ইহাকে পশুপতি বা শিবমূর্তির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। সম্ভবতঃ লিঙ্গ পূজারও



মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত শীলমোহর

প্রচলন ছিল। হরপ্পায় শিবলিঙ্গের অনুরূপ একটি কালো পাথর পাওয়া গিয়াছে। মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত একটি দেবমূর্তিকে শিবমূর্তি বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বৃক্ষ, পাথর ও একাধিক পশু-পক্ষীকে দেবদেবী মনে করিয়া উপাসনা করা হইত। সর্প পূজারও প্রচলন ছিল। মৃতদেহ সংকারেরও ব্যবস্থা ছিল। তিনটি উপায়ে মৃতদেহ সংকার করা হইত— পূর্ণ সমাধি, আংশিক সমাধি এবং দাহ করিয়া পরে সমাধি দেওয়া।

কৃষিজীবী হইলেও অধিবাসিগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল। গো-শকটের প্রচলন ছিল। জিনিসপত্র স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য উটও ছাগল ব্যবহৃত হইত।

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসিগণ (People of the Indus valley) ঃ মহেঞ্জোদাড়োর অধিবাসিগণ সম্ভবতঃ তিনটি জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। (১) ভূমধ্যসাগরীয় জাতি, (২) ককেশীয় জাতি এবং (৩) অজ্ঞাত জাতি।

বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব

আবার ইহাদের মধ্যে মঙ্গোল জাতির নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা কোন জাতির সৃষ্টি নহে। বিশেষ পরিবেশের মধ্যে একই স্থানে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি।

বৈদিক সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক (Relation of Indus Civilisation with Vedic Civilisation) ঃ

বহু বিষয়ে বৈষম্য

বৈদিক আর্যদের সহিত সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের দুই সভ্যতার মধ্যে বহু বিষয়ে বৈষম্য দেখা যায়। বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসিগণ নগর-জীবনের বিলাস-ব্যসন এবং সুখ-সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু বৈদিকযুগের আর্যগণ কখনও নগর-জীবনের সংস্পর্শে আসে নাই। সিন্ধু সভ্যতায় অশ্বের প্রচলন ছিল না। কিন্তু বৈদিক সভ্যতায় উহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। বৈদিক আর্যগণ গাভীর পূজা করিত। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় বৃষ পূজা প্রচলিত ছিল। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসিগণ মূর্তি পূজা করিত কিন্তু বৈদিক আর্যদের নিকট মূর্তি পূজা অজানা ছিল। বৈদিক যুগে আর্যগণ পুরুষ দেবতাকে প্রাধান্য দিয়াছিল, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় শিবলিঙ্গ ও মাতৃদেবীর পূজার নিদর্শন থাকিলেও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসিগণ শিব অপেক্ষা মাতৃদেবীকে অধিক ভক্তি করিত। সিন্ধু সভ্যতায় লৌহের প্রচলন ছিল না, কিন্তু বৈদিক যুগে ইহার প্রচলন দেখা যায়। এই সকল পার্থক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষাও পুরাতন।



মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত মূর্তি

ধর্মের পার্থক্য

সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি (Extent of Indus Civilisation) ঃ আমেদাবাদের লোথাল, পূর্ব-পাঞ্জাবের রূপার, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড় ও হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় এই প্রাচীন সভ্যতা সমগ্র উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল।

পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার সহিত যোগাযোগ (Connection with the civilisation of Western Asia) ঃ প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের সিন্ধু সভ্যতার সহিত পশ্চিম এশিয়ার সমসাময়িক সভ্যতার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য এবং যোগাযোগ দেখা যায়। বাগদাদের নিকটে তেল-আসমের এবং

উর'এ অনেক ভারতীয় শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহরে যেরূপ লিপি দেখা গিয়াছে ঐরূপ লিপি খোদাই করা আছে। উভয় স্থানের শীলমোহরে অংকিত একই রূপ জীবজন্তুর চিত্র, মাতৃদেবীর পূজা, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার; একই ধরনের নাগরিক জীবন প্রভৃতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। হয়ত উভয় সভ্যতার উৎপত্তিস্থান একই কিন্তু পরিবেশ ও জাতিগত প্রভেদহেতু উভয় সভ্যতার মধ্যে কিছু প্রভেদ ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার যোগাযোগ





লোথালে প্রাপ্ত শীলমোহর

আর্যদের ভারতে আগমন ও বৈদিক সভ্যতা
(Coming of the Aryans and Vedic Civilisation)

আর্যদের আদি বাসস্থান (Original homeland of the Aryans) : পুরাণের কোন উক্তির সত্যতা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আর্যরা বহিরাগত নহে, ভারতের আদিম অধিবাসী। আর্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলকে নিজেদের দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। মধ্য এশিয়ার মালভূমি এবং ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলও আর্যদের আদি বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। একজন জার্মান পণ্ডিতের মতে আর্যদের আদি বাসস্থান বোহেমিয়া, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী লইয়া গঠিত অঞ্চল। ভাষা এবং প্রকৃতিগত গঠনের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই অঞ্চল হইতে আর্যগণ ক্রমে পারস্যে এবং তারপর ভারতে প্রবেশ করে।

আদিম অধিবাসী

বহিরাগত

আর্যদের ভারতে আগমনের তারিখ (Date of the coming of the Aryans in India) : আর্যরা ঠিক কোন সময় ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিহেতু স্থান সংকুলান না হওয়ায় আর্যগণ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া খাদ্য ও বাসস্থানের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে।

আর্যদের ভারতে আগমনের তারিখ নির্ণয় করিতে হইলে ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ২৫০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভুল হইবে না।

ঋগ্বেদের রচনাকাল

আর্যদের ক্রমবিস্তার (Expansion of the Aryans) ঃ আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। ঋগ্বেদে আর্যদের সহিত অনার্যদের বিরামহীন সংগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যগণ অনার্যদের দাস বা দস্যু বলিত। আর্যগণ ক্রমে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং কুরুক্ষেত্র, কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহ এবং অঙ্গ (পূর্ব বিহার) প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আর্যদের মধ্যে কুরু এবং পাঞ্চালগণই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আর্যগণ ক্রমে দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করে। এই সকল উপজাতিগণ সম্পূর্ণভাবে আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে নাই। আর্যসভ্যতা উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

পূর্বভারতে আর্যগণের বিস্তার

দক্ষিণ ভারতে বিস্তার

বৈদিক সাহিত্য (Vedic Literature)

বৈদিক সাহিত্যের রচনা ঃ খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ হইতে ৫০০ অব্দের মধ্যে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হিন্দুদের মতে বেদ মানুষের রচিত নয়, ইহা ঈশ্বরের বাণী। 'বেদ' এই কথাটি উৎপত্তি হইয়াছে 'বিদ্' শব্দ হইতে। বিদ্ শব্দের অর্থ হইল জ্ঞান। বেদ হইল আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্যের বিভাগ (Division of the Vedic Literature) ঃ বেদ চারিখণ্ডে বিভক্ত ; (১) ঋগ্বেদ, (২) সামবেদ, (৩) যজুর্বেদ এবং (৪) অথর্ব বেদ। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদ হইল প্রাচীনতম ; সর্বশেষে রচিত হইয়াছিল অথর্ববেদ। প্রত্যেকটি বেদ আবার চারিভাগে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্বেদ

চতুর্বেদ ছাড়াও বেদাঙ্গ বা সূত্র বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গীভূত। সূত্র সাহিত্য শ্রুতির পর্যায়ভুক্ত না হইলেও উহা বেদ বিস্তার সহায়ক বলিয়া বেদের অঙ্গ বা বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গ ছয়ভাগে বিভক্ত—শিক্ষা, নিযুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও কল্প।

বেদাঙ্গ বা সূত্র সাহিত্য

বেদান্তের মধ্যে 'কল্পসূত্র' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম এই তিনটি অংশে কল্পসূত্র বিভক্ত।

কল্পসূত্র
ষড়দর্শন

বৈদিক যুগের দর্শন ছয়টি ভাগে বিভক্ত—কপিলের রচিত 'সাংখ্য', পতঞ্জলির 'যোগ', গৌতমের 'ন্যায়', কনাদের 'বৈশষিক', জৈমিনীর 'পূর্ব মীমাংসা' এবং ব্যাসের 'উত্তর মীমাংসা'।

বর্ণবিভাগ ও চতুরাশ্রম ঃ (Division of Race and the four stages) বৈদিক যুগের প্রারম্ভে জাতিভেদ প্রথা না থাকিলেও বর্ণ বিভাগ ছিল। কালক্রমে আর্যদের মধ্যে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়—ব্রাহ্মণ, রাজন্য বা ক্ষত্রিয় এবংবিশ বা জন। ব্রহ্মার মুখ হইতে আসিল ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইরূপ শ্রেণী বিভাগ রূপক বা ব্যাখ্যামূলক। আর্যসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ব্যাপক এবং জটিল হইল। যাঁহারা যাগযজ্ঞ ও বেদপাঠ করিতেন তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন করিতেন তাঁহারা হইলেন ক্ষত্রিয়। যাঁহারা কৃষিকার্য, পশুপালন এবং ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন তাঁহারা হইলেন বৈশ্য। অনার্য জাতির মধ্যে যাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করিলেন তাঁহারা হইলেন শূদ্র বা দাস। যে সমস্ত অনার্যরা বশ্যতা স্বীকার না করিয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের আর্যগণ রাক্ষস, অসুর, দানব, দৈত্য, দস্যু, বানর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিল।

তিনটি শ্রেণী

চারিটি শ্রেণীর উল্লেখ

চতুরাশ্রম

আর্যদের জীবনে চারি অবস্থায় চারি প্রকার নিয়মনিষ্ঠা পালন করিতে হইত। এই চারি অবস্থাকে বলা হইত চতুরাশ্রম। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। বাল্যকালে আর্যসন্তানকে ব্রহ্মচারী হইতে হইত। এই সময় গুরুগৃহে থাকিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হইত এবং ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইত। যৌবনে বিবাহ করিত, গৃহস্থ হইত এবং গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিত। প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইত। এই বয়সে বনে গিয়া তপস্যা করিতে হইত। বৃদ্ধ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইত এবং পরমার্থ চিন্তায় জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইত।

বৈদিক যুগের ধর্ম (Religion in the Vedic period) ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে আর্যগণ উপাসনা করিত। যেমন, অগ্নি, রুদ্র,

মরুৎ প্রভৃতি। বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, মনু, বাক প্রভৃতি দেবতার পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ। ঋগ্বেদে উষা, সরস্বতী প্রভৃতি নারী-দেবতার উল্লেখ আছে। আর্যগণ কিন্তু বহু দেব-দেবীর উপাসনা করিলেও তাহারা পৌত্তলিক ছিল না। বৈদিক ধর্মে মন্দিরের কোন স্থান নাই।

প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা, পৌত্তলিক নহে

বৈদিক যুগের আর্যগণের সামাজিক, ও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন (ঋগ্বেদের যুগ) (Social, Economic and Political organisations of the Aryans in the Rigvedic period) ঃ বৈদিক যুগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ঋগ্বেদের যুগকে প্রাচীন বৈদিক যুগ এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের যুগকে পরবর্তী বৈদিক যুগ বলা হয়।

(১) **আর্যদের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য (Political Disunity) ঃ** বিজয়ী আর্যদের মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। দিবোদাস নামক একজন আর্য রাজা, তুর্ভাস, যদু এবং পুরুগণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার পুত্র (অথবা পৌত্র) ভরতরাজ সুদাস অন্যান্য আর্যদের সঙ্গে এক ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। আর্যদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভারত, সঞ্জয়, পাঞ্চাল, পুরু, কুরু এবং মৎস্যগণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

(২) **রাজনৈতিক সংগঠন (Political Organisation) ঃ** বৈদিক যুগে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল ; অবশ্য প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়গণ রাজা হইতেন। রাজাগণ উত্তরাধিকারী সূত্রে রাজপদ প্রাপ্ত হইতেন। আর্য সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বনিম্নে ছিল পিতৃপ্রধান পরিবার। কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি গ্রাম গঠিত হইত, গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন গ্রামনী। কতকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত হইত **বিশ্**। বিশের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন বিশ্‌পতি বা রাজন্। অনেকক্ষেত্রে কয়েকটি বিশ্ লইয়া একটি জন গঠিত এবং ইহারও সর্বোচ্চ শাসক হইতেন রাজা। রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেও প্রজাগণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা ছিলেন প্রধান বিচারপতি এবং সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বিভিন্ন কার্যে রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। পুরোহিতের অনেক

পরিবার, গ্রাম, বিশ, জন

রাজা

সেনানী, গ্রামনী পুরোহিত

ক্ষমতা ছিল। তিনি নানা বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দিতেন। রাজা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। সভা এবং সমিতি নামক দুইটি জন প্রতিষ্ঠান দ্বারা রাজ-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হইত। সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক এবং রথ এই দুইটি বিভাগ ছিল। অশ্বেরও প্রচলন ছিল। যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে তীর, ধনুক ও বর্শার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সভাসমিতি
যুদ্ধাস্ত্র

সামাজিক ব্যবস্থা (Social Condition) ঃ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল পিতৃপ্রধান পরিবার.। পরিবারের প্রধান ছিলেন পিতা। সমাজে নারীর স্থান ছিল খুব উচ্চে। গৃহস্থালীর ব্যাপারে নারী ছিল সর্বময়ী কর্ত্রী। শিক্ষিতা এবং সাংস্কৃতিক রুচিসম্পন্না নারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংহিতার অনেক স্তোত্র নারীদের রচিত। ঋগ্বেদের যুগে অপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা, মমতা প্রভৃতি মহিলাগণ বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। নারীদের নৈতিক জীবনের মান ছিল খুব উচ্চে।

পিতৃপ্রধান পরিবার
সমাজে নারীর স্থান

প্রাচীন বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই প্রথার প্রচলন ছিল না। কিন্তু অন্যদের অভিমত হইতেছে এই যে, ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের যুগে বর্ণভেদ আরম্ভ হইলেও কঠোর আকার ধারণ করে নাই। তবে ব্রাহ্মণদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য ছিল।

বর্ণভেদ ও জাতিভেদ

অর্থনৈতিক জীবন (Economic life) ঃ আর্য সভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা। পশুপালন এবং কৃষিই ছিল আর্যদের প্রধান উপজীবিকা। জনসাধারণ গ্রামে বাস করিত। অশ্ব আর্যগণের নিকট খুব উপকারী বলিয়া পরিগণিত হইত। অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে ভেড়া, ছাগল, গাধা এবং কুকুর ছিল প্রধান। কৃষির জন্য সেচ ব্যবস্থা ছিল। জিনিসপত্রের বিনিময় এবং মূল্য গোধন দ্বারা নির্ধারিত হইত। নিষ্ক নামক এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে সূত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় এবং কুম্ভকারের উল্লেখ আছে। আর্যগণ ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতি এবং ভারতের বাহিরে এশিয়ার অন্যান্য জাতির সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করিত। জলপথে চলাচলের জন্য বড় বড় নৌকা ব্যবহার করা হইত। স্থলপথে যানবাহনের জন্য অশ্ববাহিত রথ এবং গো-শকট ব্যবহৃত হইত।

আর্যদের বেশভূষা অনাড়ম্বর ছিল। তাহাদের পরিধেয় সাধারণতঃ ভেড়ার লোম হইতে পশম দ্বারা প্রস্তুত হইত। নরনারী নির্বিশেষে সকলেই স্বর্ণালঙ্কার পরিত এবং উষ্ণীষ ব্যবহার করিত। তিন রকম পরিচ্ছদ প্রচলিত ছিল 'নীবি' (কোটি বন্ধন বস্ত্র), 'বাস' বা পরিধান (বস্ত্র) এবং 'অধিবাস' বা 'দ্রাপি' (উত্তরীয়)। গম, যব, ফলফুল, সব্জী, ঘি, মাখন, দুগ্ধ, মধু প্রভৃতি আর্যদের খাদ্য ছিল। কোন পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ বা উৎসবে আর্যরা মাংস গ্রহণ করিত। ভেড়া, ঘোড়া, ছাগল ও মহিষের মাংস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা সোমরস এবং সুরা নামক উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করিত।

বেশভূষা

খাদ্য

আর্যদের আমোদপ্রমোদের মধ্যে মৃগয়া, অশ্ব ও রথ চালনা, নৃত্য-গীত এবং পাশা খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃত্যগীতের সময় 'বীণা', 'বান' এবং 'ঢাক' প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হইত। বৈদিক যুগে দাস প্রথার প্রচলন দেখা যায়। বিজিত অনার্যগণ আর্যপরিবারে দাসত্ব করিতে বাধ্য হইত।

আমোদপ্রমোদ

পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন (Social and Political changes in the Later Vedic Period) ঃ

ঋগ্বেদের রচনাকাল এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থের রচনাকালের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার বৎসরের ব্যবধান ছিল। এই সময়ের মধ্যে অনার্যগণ সপ্তসিন্ধু অঞ্চল হইতে অগ্রসর হইয়া উত্তর ভারতের ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অনার্যদের সংস্পর্শে আসিবার ফলে আর্য সভ্যতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটিয়াছিল।

আর্যদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার ফলে কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, কাশী প্রভৃতি কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। কোন রাজা প্রতিবেশী রাজ্য জয় করিলে 'সম্রাট' 'সার্বভৌম' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই সময় হইতে রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়।

রাজনৈতিক পরিবর্তন
রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি

ঋগ্বেদের ন্যায় এই যুগেও আর্যরা গ্রামে বাস করিত। এই যুগে নগরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নারীর মর্যাদা অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছিল। এই যুগের প্রতিভাসম্পন্না নারীদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ও গার্গীর নাম উল্লেখযোগ্য। জাতি ও বর্ণভেদ প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ইহার কঠোরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সামাজিক অবস্থা
জাতিভেদ ও বর্ণবিভাগ

ধর্ম ব্যবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং দার্শনিক তত্ত্বের উন্নতি হইয়াছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থনৈতিক জীবনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। জনসাধারণ কৃষিজীবি হইলেও এবং গ্রামে বসবাস করিলেও এই যুগে নগর গড়িয়া উঠে। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই যুগে ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠী বা সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মহাকাব্য : রামায়ণ ও মহাভারত (Epics : Ramayana and Mahabharata) : রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের প্রথম মহাকাব্য। এই দুইখানি গ্রন্থ ভারতের সর্বত্র হিন্দুদের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়। রামায়ণের লেখক একমাত্র বাল্মিকী, কিন্তু মহাভারতের লেখক একমাত্র ব্যাসদেব নহেন। রামায়ণ এবং মহাভারতের মূল ঘটনার সহিত পরবর্তী কালে সংশ্লিষ্ট নহে এমন অনেক ঘটনা মহাকাব্যদ্বয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মহাকাব্যদ্বয়ের রচনাকাল

মহাকাব্যের গুরুত্ব (Importance of the Epics) : মহাকাব্য হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ; এই সময় আর্যগণ দাক্ষিণাত্যে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের অভিযান দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের একটি দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্যের যুগে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, হস্তিনা এবং ইন্দ্রপ্রস্থের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, সমাজে চারিটি শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। সামরিক শ্রেণী যাহার সর্বোচ্চে থাকিতেন রাজা, পুরোহিত শ্রেণী, বণিক শ্রেণী এবং কৃষিজীবী সম্প্রদায়; সর্বনিম্নে থাকিত শূদ্র এবং দাস। জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, মহাকাব্যের যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে বর্ণ শংকরের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর্য অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে চণ্ডাল, আভীর, নিষাদ প্রভৃতি মিশ্র শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ষষ্ঠতঃ, নারীদের স্বাধীনতা বহুলাংশে কমিয়া যায় কিন্তু তাঁহারা সমাজে মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। সপ্তমতঃ, সমগ্র দেশব্যাপী কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অষ্টমতঃ, কৃষি ছিল জীবিকার প্রধান উপায়। অনেকে পশুপালন ও শিকার করিয়াও জীবিকা অর্জন করিত।

সামাজিক অবস্থা

চতুর্থ অধ্যায়
বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের অভ্যুদয়
Growth of Buddhism and Jainism

জৈন ধর্মঃ পার্শ্বনাথ ও মহাবীরঃ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় সমসাময়িক। জৈনদের মতে বহু প্রাচীনকালে হইতেই জৈন ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল। জৈন ধর্মগুরুগণ তীর্থংকর নামে পরিচিত। জৈন ধর্মে এইরূপ চব্বিশজন তীর্থংকর ছিলেন। মহাবীর হইলেন সর্বশেষ তীর্থংকর এবং তাঁহার পূর্ববর্তী হইলেন পার্শ্বনাথ। পার্শ্বনাথের দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পরে মহাবীর আবির্ভূত হন। পার্শ্বনাথ কাশীর কোন ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যান। তাঁহার উপদেশগুলি চতুর্যাম নামে খ্যাত—অহিংসা, সত্যভাষণ, অচৌর্য (চুরি না করা) এবং অপরিগ্রহ (পার্থিব কোন কিছু ভোগ না করা)।

পার্শ্বনাথ

মহাবীর হইলেন জৈনধর্মের চতুর্বিংশ বা সর্বশেষ তীর্থংকর। সম্ভবতঃ তিনি ৫৪০ খৃঃ পূর্বাব্দে উত্তর বিহারে অবস্থিত বৈশালীর নিকট কুন্দগ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সিদ্ধার্থ এবং মাতা ছিলেন বৈশালীর লিচ্ছবি-বংশীয় ত্রিশলা।

মহাবীর

মহাবীর যশোদা নাম্নী এক ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনে পরিবর্তন আসে। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কঠোর তপস্যার পর ৪২ বৎসর বয়সে তিনি সিদ্ধিলাভ (কৈবল্য) করেন এবং জিন বা নির্গ্রন্থ (পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন মুক্ত) নামে পরিচিত হন। এই নাম হইতেই তাঁহার অনুগামীরা জৈন নামে অভিহিত হন। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তিনি



মহাবীর

কোশল, মগধ, অঙ্গ ও মিথিলায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন এবং প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে বর্তমান পাটনা জেলার পাবা নগরে দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক ৪৬৮

খৃঃ পূঃ)। সম্ভবতঃ মগধের পরাক্রমশালী রাজা বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি পার্শ্বনাথের চারিটি উপদেশের সহিত আর একটি আদর্শ যোগ করেন তাহা হইল 'শুচিতা'।

জৈন ধর্মমত (Jainism)ঃ জৈনগণ বেদের অনুশাসন এবং পশুবলিপ্রথা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধগণ অপেক্ষা জৈনগণ কঠোরভাবে অহিংসনীতি পালন করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন প্রত্যেক বস্তুরই প্রাণ (জীব) আছে এবং তাহা সজ্ঞান। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জৈনগণ বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে মানুষের সকল গুণ এবং শক্তির শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ বিকাশ হইল ঈশ্বর। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা প্রায় ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। জৈনগণ হিন্দুধর্মের কর্মবাদ নীতিতে বিশ্বাসী। জৈনগণ বিশ্বাস করেন মানুষ অতীত জীবনের কর্মফল লইয়া পৃথিবীতে আসে এবং কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে যথার্থ জ্ঞান, যথার্থ বিশ্বাস এবং সদাচরণ এই 'ত্রিরত্ন' অনুসরণ করিতে হইবে। জৈনগণ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী।

অহিংসা

ভগবান অস্বীকার

ত্রিরত্ন

জৈন ধর্মের আদি ইতিহাসঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সম্ভবতঃ মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই জৈন ধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে জৈন ধর্মের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর। শ্বেতাম্বরগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত এবং দিগম্বরগণ মহাবীরের অনুকরণে নগ্ন থাকিত।

শ্বেতাম্বর, দিগম্বর

জৈনদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ ঃ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে পাটলীপুত্রে আহুত এক জৈন সম্মেলনে মহাবীরের উপদেশাবলী বারটি অঙ্গে সংকলিত হয়। ইহা 'দ্বাদশ অঙ্গ' নামে পরিচিত। কালক্রমে সর্বশেষ অঙ্গটি হারাইয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বল্লভিতে একটি জৈন সম্মেলন আহুত হয় এবং এখানে এগারটি অঙ্গ পূর্ণবিন্যাস করা হয়। কিন্তু দিগম্বরগণ কর্তৃক এই অঙ্গ ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং ইহা একমাত্র শ্বেতাম্বরদের ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থ একরূপ প্রাকৃত ভাষায় লেখা যাহা অর্শ বা অর্ধ মগধী নামে পরিচিত। সপ্তম এবং অষ্টম খৃষ্টাব্দ হইতে ভাষ্য এবং দার্শনিক গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচনা আরম্ভ হয়।

দ্বাদশ অঙ্গ

বৌদ্ধধর্ম : গৌতম বুদ্ধ : বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ৫৬৬ অথবা ৬২৪ খৃঃ পূঃ কপিলাবস্তুর নিকট লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় রাজা (নির্বাচিত শাসক) শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন। এই জন্য তাঁহার অপর এক নাম ছিল শাক্যসিংহ। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল সিদ্ধার্থ, অপর নাম ছিল গৌতম। বিপুল ঐশ্বর্য এবং বিলাসের মধ্যে তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। ষোল বৎসর বয়সে যশোধারা বা গোপা নাম্নী এক রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার রাহুল নামক এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইতিপূর্বেই সংসারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ কমিয়া আসিয়াছিল। জীবের দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে। অবশেষে একদিন তিনি স্ত্রী, পুত্র ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া জরা, মৃত্যু, ব্যাধি ও দুঃখের হাত হইতে মানুষের মুক্তির সন্ধানে সন্ন্যাসী হইয়া যান। এই ঘটনা 'মহাভি নিষ্ক্রমণ' নামে খ্যাত।

প্রথম জীবন

মহাভিনিষ্ক্রমণ



বুদ্ধ

ইহার পর তিনি রাজগৃহে দুইজন বিখ্যাত গুরুর নিকট দর্শন এবং নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি হয় না। পরিশেষে তিনি বর্তমান বুদ্ধ গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে গমন করেন এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হন। কিন্তু অভীষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেন না। অতঃপর পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে কঠোর তপস্যার পর তিনি দিব্য জ্ঞান বা বোধিলাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি বুদ্ধ (পরম জ্ঞানী) বা 'তথাগত' (যিনি সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন) নামে পরিচিত হইলেন। পরমজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি বারাণসীর নিকট সারনাথে মৃগ উদ্যানে প্রথম তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। এখানে তাঁহার প্রিয় পঞ্চ-শিষ্যকে প্রথম উপদেশ বিতরণ করেন; এই ঘটনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে

বোধিলাভ

খ্যাত। জীবনের বাকী পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি অযোধ্যা, বিহার, উত্তর-প্রদেশ এবং অন্যান্য স্থানে ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন। মগধরাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আশী বৎসর বয়সে গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগরে নির্বাণলাভ (দেহত্যাগ) করেন। তাঁহার নির্বাণকাল লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের মতে ৪৮৬ খৃঃ পূঃ, কাহারও মতে ৫৪৩ খৃঃ পূঃ এবং চৈনিক সাক্ষ্য প্রমাণে ৪৮৩ খৃঃ পূঃ বুদ্ধের পরিনির্বাণ ঘটে।

নির্বাণলাভ

বৌদ্ধ সংঘ ঃ বুদ্ধ তাঁহার ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংঘ গঠন করেন। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ এই তিনটি হইল বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিস্তম্ভ স্বরূপ। এই সংঘ হইল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতিষ্ঠান।

বৌদ্ধসংঘের গঠন

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি—এই। তিনটি বৌদ্ধদের দীক্ষামন্ত্র। সংঘের সভ্যদের ভিক্ষাই ছিল জীবনাধারণের প্রধান উপায়। আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও উপাসনা সম্বন্ধে নানা অনুশাসন বা নির্দেশ ছিল। তীর্থ-দর্শন বৌদ্ধ ধর্ম-জীবনের অন্যতম অঙ্গ। বৌদ্ধ সংঘ বলিতে বহু স্থানীয় সংঘ বুঝাইত। কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন না। অন্ততঃ দশজন ভিক্ষু একত্রে না বসিলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত না। সংঘের কার্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল।



বুদ্ধগয়ার মন্দির

বৌদ্ধ ধর্মমত (Buddhism) ঃ বুদ্ধের বাণী ছিল সহজ ও সরল। সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে মানুষ যাহাতে মুক্তি পায় তাহাই ছিল তাঁহার জীবনের একান্ত কামনা। এইজন্য তিনি চারিটি 'মহান সত্যের' (আর্য সত্যের) ব্যাখ্যা করেন। এইগুলি হইল (১) সংসারের দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, (২) এই দুঃখ-কষ্টের কারণও আছে, (৩) দুঃখ-কষ্টের অবসান করিতে হইবে এবং (৪) এই দুঃখ-কষ্টের অবসান করিতে হইলে সত্যপথ জানিতে হইবে। বুদ্ধের মতে জন্মই দুঃখের কারণ। কোন পার্থিব ভোগের আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে তাহা হইলে দুঃখকষ্টও থাকিবে না। তিনি

চারিটি মহান সত্য

বলিয়াছেন, নির্বাণলাভই জীবনের লক্ষ্য। নির্বাণ লাভের জন্য তিনি অষ্টপন্থা বা অষ্টমার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। এই অষ্টপন্থা বা আটটি পথ হইল, সৎচিন্তা, সৎবাক্য, সৎকর্ম, সৎ উপায়ে জীবনধারণ, সৎসঙ্কল্প, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই অষ্টমার্গের নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও তিনি ভিক্ষুদের পাঁচটি নৈতিক নিয়ম পালনের উপদেশ দেন—অহিংসা, অচৌর্য, সংযম, সত্য ভাষণ ও বৈরাগ্য। ইহা 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্ম দেবদেবী, যাগযজ্ঞ ও বর্ণভেদ বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও করে নাই, অস্বীকারও করে নাই। জীবে প্রেম এবং অহিংসা বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

অষ্টপন্থা

পঞ্চশীল

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ (Buddhist Religions Texts) : বুদ্ধের নির্বাণলাভের অল্পকাল পরেই তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহে এক সম্মেলনে (সঙ্গীতি) মিলিত হইয়া বুদ্ধের উপদেশাবলী পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ইহার এক শতাব্দী পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে অশোকের সময় পাটলীপুত্রে এবং কণিষ্কের সময়ে কাশ্মীরে। পালিভাষায় সংকলিত বৌদ্ধদের এই ধর্ম গ্রন্থের নাম হইল **ত্রিপিটক**। তিনটি খণ্ডে ইহা বিভক্ত। যথা,—বিনয় পিটক, সুত্তপিটক, অভিধর্মপিটক। জাতক কাহিনীগুলিও বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

ত্রিপিটক, জাতক

বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্যের কারণ (Causes of the Success of Buddhism) : বুদ্ধের মৃত্যুর পর হইতে সম্রাট অশোকের সিংহাসনে আরোহণের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচার ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে বিস্তারলাভ করে। বৌদ্ধ সংঘের ভ্রাতৃত্বমূলক এবং গণতান্ত্রিক গঠনের ফলে ইহা অতি শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সরল এবং আদর্শ জীবনযাপন প্রণালী বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের বিদেশে সাফল্যলাভের কারণ হইতেছে যে ইহা বিদেশীদের আচার-ব্যবহার ও প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিয়াছিল। ধর্মীয় উদারতাও বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্যের অন্যতম কারণ। জনসাধারণের 'বিভিন্ন' সংস্কার ও বিশ্বাস থাকা

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা

সরলতা

সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। বৈদিক ধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ ও জটিল ক্রিয়াকর্ম, যাগ-যজ্ঞাদি, কঠোর জাতিভেদ প্রথা নিম্নশ্রেণীর উপর ব্রাহ্মণদের নির্যাতন এবং ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের ক্ষোভ বৌদ্ধধর্মকে ভারতে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বিরোধিতা

বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ (Causes of the downfall of Buddhism) ঃ বৌদ্ধধর্ম যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল তখন ভারতের জনসাধারণের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি লুপ্ত হইয়া যায় নাই, জনসাধারণের উপর তাহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা কিছু কমিয়া গিয়াছিল মাত্র। কিন্তু গুপ্ত যুগে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মে মহাযান মতের উৎপত্তি ও বুদ্ধের মূর্তিপূজা প্রচলিত হইবার ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য কমিয়া আসিল। মৌর্যযুগের অবসানের পর কনিষ্ক এবং হর্ষবর্ধন ছাড়া অন্য কোন রাজা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও বৌদ্ধধর্মের পতনের অন্যতম কারণ। হিন্দু ধর্মের উদারতা ও সমন্বয়ী চিন্তাধারা বৌদ্ধধর্মের পতনের আরও একটি কারণ। এই উদারতা ও সহনশীলতার ফলেই বৌদ্ধধর্মের অনেক রীতিনীতি ও আদর্শ কালক্রমে হিন্দুধর্মে গৃহীত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূলগত বৈশিষ্ট্য অনেকখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হীনযান এবং মহাযান এই দুই মতের উদ্ভব হইয়াছিল। নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতার ফলে বৌদ্ধগণ পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে বহুবিধ দুর্নীতি এবং অনাচার প্রবেশ করিবার ফলে বৌদ্ধধর্মের আভ্যন্তরীণ শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরুদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানগণের আগমনের পর হইতে তাহারা অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও চৈত্য লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছিল, বুদ্ধ মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিলে তাহাদের হত্যা করিত। মুসলমানদের অত্যাচারের ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মূর্তিপূজার প্রচলন

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

অন্তর্বিরোধ বৌদ্ধ সংঘের দুর্নীতি

মুসলমানদের ধ্বংসকার্য

পঞ্চম অধ্যায়
বৈদেশিক আক্রমণ
(Foreign Invasions)

পারসিকদের ভারত আক্রমণ (Persian Invasion) ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বে পারস্যের সম্রাটগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ (৫৫৮-৩০ খৃঃ পূঃ) পারস্যের সম্রাট ছিলেন কুরুষ বা কাইরাস। তিনি সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। কাইরাস বংশের তৃতীয় সম্রাট দারায়ুস গান্ধার এবং সিন্ধু উপত্যকা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দারায়ুসের পুত্র জারেকসিস গ্রীক আক্রমণের সময় বহু ভারতীয় তীরন্দাজকে তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। আলেকজাণ্ডারের নিকট পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস পরাজিত হইলে ভারতে পারসিক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং এই অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক অধিকারের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। পারসিকগণ ভারতে অরমীয় লেখার প্রচলন করেন, যাহা হইতে খারোস্থি লিপির উৎপত্তি হয়। মৌর্যযুগের স্থাপত্যে পারসিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পারসিক শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল ক্ষত্রপ। পারসিক আক্রমণের ফলে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য দেশগুলির সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

কাইরাস, দারায়ুস, জারেকসিস

ফলাফল

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (Alexander's Invasion) ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল রাজতান্ত্রিক এবং কতকগুলি ছিল প্রজাতান্ত্রিক বা অভিজাতগণ কর্তৃক শাসিত রাজ্য। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। ইহারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। এইজন্য কোন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা ইহাদের ছিল না। এই সকল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তক্ষশীলা, পুরুর রাজ্য এবং অভিসার বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল। পূর্ব ভারতে শক্তিশালী মগধ সাম্রাজ্য ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা

ম্যাসিডনের অধিপতি আলেকজাণ্ডার পারসিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। তিনি পারসিক সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া ব্যাকট্রিয়া অধিকারের পর ৩২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং কাবুলের নিকটে সৈন্য শিবির স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি সোয়াত এবং বাজাউর উপত্যকার পার্বত্য উপজাতিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করেন। ৩২৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশীলা অভিমুখে অগ্রসর হন। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আলেকজাণ্ডারকে বহু উপঢৌকন প্রদান করেন। অতঃপর অম্ভির সাহায্য লইয়া আলেকজাণ্ডার পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া ঝিলাম নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন পুরু। তিনি অসাধারণ বীরত্বের সহিত আলেকজাণ্ডারকে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। এই যুদ্ধ হিদাসপিসের যুদ্ধ নামে খ্যাত। আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ও পুরুকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যার্পণ করেন এবং আরও কয়েকটি রাজ্য প্রদান করেন। ইহার পর আলেকজাণ্ডার আরও কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। সৈন্যসহ আলেকজাণ্ডার যখন বিপাশা নদীর তীরে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল অজানা দেশের অভ্যন্তরে আর অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। দীর্ঘযুদ্ধে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা পুরুর শৌর্যবীর্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং মগধের শক্তির কথা শুনিয়াছিল, এইজন্য তাহারা আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।



আলেকজাণ্ডার

পুরুর সহিত যুদ্ধ

হিদাসপিসের যুদ্ধ

সুতরাং আলেকজাণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঝিলাম এবং পিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনভার পুরুর উপর এবং সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনভার অম্ভির উপর অর্পণ করিলেন।

সৈন্যবাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি সৈন্যদলকে সেনাপতি নিয়ার কসের নেতৃত্বে সমুদ্রপথে পারস্যের দিকে প্রেরণ করিলেন এবং আর একদল সৈন্যসহ আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া স্বদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ৩২৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তিনি পারস্যের সুসা নগরে উপনীত হন এবং ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তিনি ব্যবিলন নগরে উপস্থিত হন। এইখানেই মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (৩২৩ খৃঃ পূঃ)।

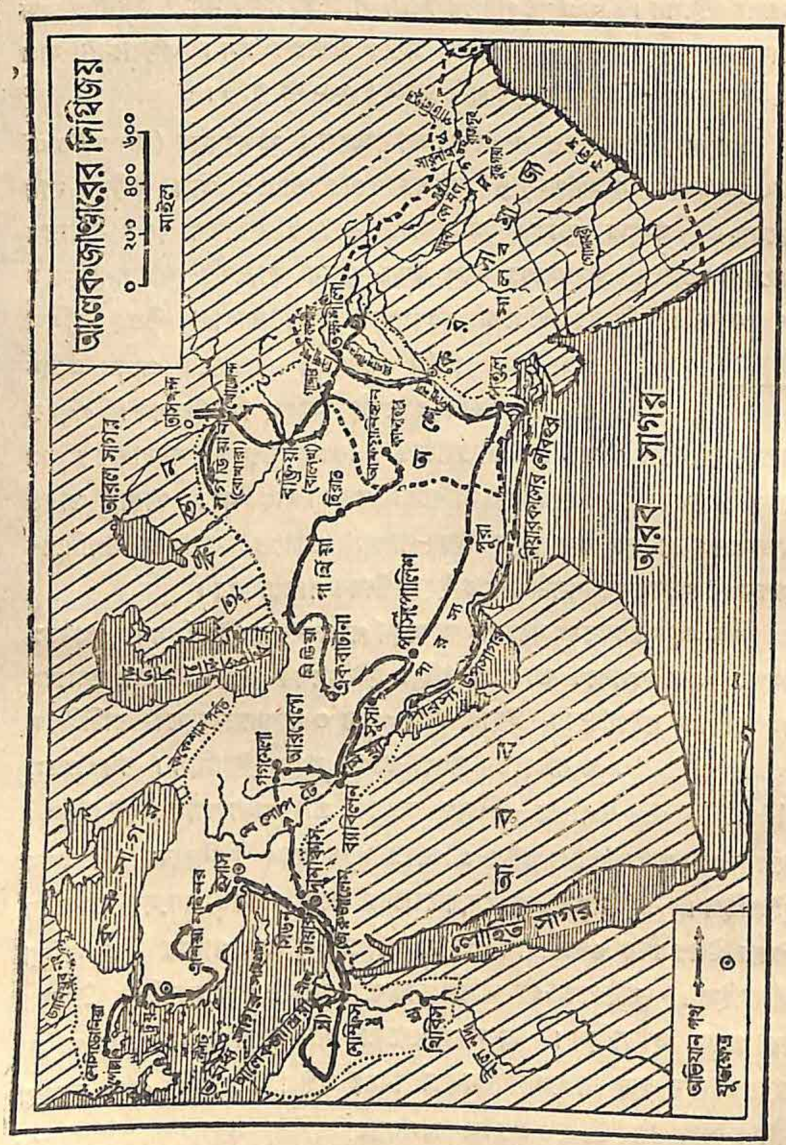
আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল (Results of Alexander's Invasion)ঃ আলেকজাণ্ডার ভারতে মাত্র উনিশ মাস ছিলেন। তাঁহার ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফলাফল খুবই সামান্য। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদিগকে যে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা তাহারা শীঘ্রই ভুলিয়া গিয়াছিল। তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। পাঞ্জাব হইতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কোন উল্লেখ সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে রচিত ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল হইল উত্তর-পশ্চিম ভারতে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন। অশোকের শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ ফল

কিন্তু এই অভিযানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ ফল হইয়াছিল। প্রথমতঃ, জলপথে এবং স্থলপথে ভারতের সহিত ইউরোপের কয়েকটি যোগাযোগের পথ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন সহজ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম এশিয়ায় কয়েকটি গ্রীক রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে ভারতবাসী ও ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হইয়াছিল। এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে পরবর্তী কালের ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীক ও রোমান প্রভাব পড়িয়াছিল এবং গান্ধার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, এই অভিযানের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে উত্তর ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, বৌদ্ধধর্ম গ্রীকদের ধর্মীয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্মেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, আলেকজাণ্ডারের

পরোক্ষ ফল

সঙ্গে যে সকল গ্রীক ভারতে আসিয়াছিল তাহাদের অনেকেই ভারত সম্পর্কে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণী ভারতের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান।



ব্যাক্‌ট্রিয়.গ্রীকগণ (The Bactrian Greeks) ঃ আনুমানিক ২৫০ খৃঃ পূর্বাব্দে ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্তা ডিয়োডোটস্‌, সেলুকসের পৌত্র

সিরিয়ার অধিপতি এণ্টিওকস থিয়স-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ডিয়োডোটস্ তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্যাক্ট্রিয়ার তৃতীয় রাজা ছিলেন ইউথিডিমস্। তাঁহার সময়ে সিরিয়ার অধিপতি এণ্টিওকস্ ব্যাক্ট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। ইউথিডিমসের পুত্র ডেমিট্রিয়স-এর সহিত এণ্টিওকস-এর কন্যার বিবাহ হয়। এণ্টিওকস্ হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া কাবুল উপত্যকার ভারতীয় নৃপতি সুভাগ-সেনকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি হস্তী ও প্রচুর অর্থ উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন (২০৬ খৃঃ পূঃ)। ইউথিডিমস্ আফগানিস্থানের কিয়দংশ ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী **ডেমিট্রিয়স** খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে ব্যাক্ট্রিয়ার রাজা হন। তিনি পাঞ্জাবের একাংশ জয় করিয়া লন। কিন্তু তিনি যখন ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন তখন ইউক্রাটাইডিস নামক একজন গ্রীক সেনাপতি ব্যাক্ট্রিয়া অধিকার করিয়া লন। ডেমিট্রিয়সের পক্ষে ব্যাক্ট্রিয়া উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তিনি সিন্ধু উপত্যকায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'ভারতীয় নরপতি' বলিয়া অভিহিত হন। তিনি শকলা বা শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করেন এবং গ্রীক ও খারোস্থী উভয় ভাষায় (দ্বিভাষিক) মুদ্রা প্রচলন করেন।

ডেমিট্রিয়স

গ্রীকরাজগণের মধ্যে **মিনান্দারই** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আফগানিস্থান হইতে কাথিওয়াড় পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কাবুল, মথুরা এবং বুন্দেলখণ্ডে তাঁহার নামাংকিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্লুটার্ক তাঁহাকে বহু নগরীর অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'মিলিন্দপনহো' নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাকে রাজা মিলিন্দ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মিনান্দার সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজধানী শকলা বা শিয়ালকোটে অনেক সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন।

মিনান্দার

মিনান্দারের পরে গ্রীকগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। গ্রীকদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। ইউক্রাটাইডিস ও ইউথিডিমসের বংশধরগণ পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। শেষ গ্রীক রাজা হারমাইয়স কুষাণরাজ প্রথম কদ্‌ফিসেস-এর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের অবসান হয়।

গ্রীক শাসনের অবসান

পহ্লব বা পার্থিয়গণ (The Parthians) ঃ পহ্লবগণ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত পার্থিয়ায় বসবাস করিত। আনুমানিক ২৪৮ খৃঃ পূর্বাব্দে তাহারা সিরিয়ার গ্রীক সাম্রাজ্যের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। প্রথম মিথ্রিডেটিস্-এর অধীনে পহ্লবগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ব্যাক্ট্রিয়া দখল করিয়া লয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গান্ধারের এক অংশ শকদের হস্ত হইতে পহ্লবদের অধিকারে চলিয়া যায়।

গণ্ডোফার্নিস

ভারতীয় পহ্লবরাজগণের মধ্যে **গণ্ডোফার্নিস** ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তক্ষশিলা, কাবুল ও কান্দাহার তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। খৃষ্টানদের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে, সেণ্ট টমাস নামক একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক এই সময় ভারতে আসেন এবং গণ্ডোফার্নিস তাঁহার নিকট হইতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আফগানিস্থান, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশের পহ্লব রাজ্যগুলি কুষাণগণের দ্বারা পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

শকগণ (The Sakas) ঃ শক জাতির আদিম বাসস্থান ছিল মধ্য-এশিয়ার সিরদরিয়া নদীর উত্তরাঞ্চলে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ইউ-চি নামক অপর এক জাতির আক্রমণের ফলে শকগণ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া ব্যাক্ট্রিয়া ও পার্থিয়া দখল করিয়া লয়। দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিস্-এর নেতৃত্বে (১২৩-৮৮ খৃঃ পূর্বাব্দ) পার্থিয়গণের পুনরভ্যুত্থান হইলে শকগণ তাহাদের নূতন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া সিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সময় মধ্য-এশিয়া ও ভারতের সীমান্তে গ্রীক রাজ্যগুলি থাকাতে শকগণ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পরে তাহারা দক্ষিণ আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধু উপত্যকার দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে।

আদি বাসস্থান, ভারতে প্রবেশ

ভারতীয় শিলালিপিতে প্রথম শক শাসকগণের মধ্যে ময়েস বা মোগ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি গান্ধারের শাসক ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৩৫ খৃঃ পূর্বাব্দ হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য কাবুল উপত্যকা হইতে পূর্ব পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। ময়েস-এর পরবর্তী রাজা প্রথম আজেস পূর্ব পাঞ্জাব দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

ময়েস বা মোগ

মথুরায় আর একটি শকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারা সাত্রাপ বা ক্ষত্রপ নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ এই বংশের রাজুবুল পূর্ব পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান।

শক ক্ষত্রপগণের আর এক বংশ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে রাজ্য স্থাপন করেন। ইহারা 'ক্ষহরত' নামে পরিচিত ছিলেন। এই বংশের ভূম্যক সৌরাষ্ট্রে (কাথিওয়াড়) শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। **নাহাপান** সাতবাহনদের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লন। তাঁহার প্রভাব কাথিওয়াড়, মালব ও আজমীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ১১২ খৃঃ হইতে ১২৭ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সাতবাহন বংশের রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর হস্তে তিনি পরাজিত হন।

নাহাপান

শক ক্ষত্রগণের আর এক শাখা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিত। ইহারা শক জাতির কর্দমক বংশ হইতে উদ্ভূত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন চষ্টান। সম্ভবতঃ তিনি ১৩০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে বা পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র রুদ্রদমন ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। জুনাগড় শিলালিপি অনুযায়ী মালব, গুজরাট, কাথিওয়াড়, মাড়বার, উত্তর কঙ্কন এবং দক্ষিণসিন্ধু তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুদ্রদমন একজন নিপুণ সেনাপতি, সুশাসক, বিদ্বান এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রুদ্রদমনের পর শকগণের পতন আরম্ভ হয়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতে শকরাজ্যের বিলোপ সাধন করেন।

রুদ্রদমন

কুষাণ সাম্রাজ্য (The Kushan Empire): শক ও পহ্লবদের পর ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। কুষাণগণ মধ্য এশিয়ার ইউ-চি নামক এক যাযাবর জাতির শাখা। ইউ-চিগণ উত্তর-পশ্চিম চীনে তাহাদের বাসস্থান হইতে হিউংনু নামক মধ্য-এশিয়ার আর একটি জাতি দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা প্রথমে সির-দরিয়া নদীর উপত্যকায় বাস করিতে থাকে। কিন্তু সেখান হইতে আর একটি যাযাবর জাতির দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অক্ষু নদীর উপত্যকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এখানে তাহারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে। ক্রমে ইউ-চিগণ পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই পাঁচটি শাখার একটি হইল কুষাণ।

প্রথম কদ্‌ফিসেস্: কুষাণ নায়ক কুজুলা কদ্‌ফিসেস্ বা **প্রথম কদ্‌ফিসেস্** ইউ-চি অন্যান্য জাতির শাখাকে নিজের শাসনাধীনে আনিয়া ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি কাবুল উপত্যকা হইতে ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকদের বিতাড়িত করেন এবং পার্থিয়গণের নিকট হইতে গান্ধার ও দক্ষিণ আফগানিস্থান জয়

করেন। কুষাণ রাজগণের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম নিজ নামাংকিত মুদ্রা ভারতে প্রচলিত করেন। এই সময় সম্ভবতঃ ভারতের সহিত চীন ও রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রায় রোম সম্রাট অগাস্টাসের মুদ্রার প্রভাব দেখা যায়।

প্রথম কদ্‌ফিসেস

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস্ঃ প্রথম কদ্‌ফিসেস্-এর পর **দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস্** বা বিম কদ্‌ফিসেস্ কুষাণ সাম্রাজ্যের রাজা হন। তিনি পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি শিবের উপাসক ছিলেন।

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস্

কণিষ্কঃ দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস-এর পর কুষাণ সাম্রাজ্যের রাজা হন কণিষ্ক। কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। কণিষ্কের রাজত্বকাল লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৭৮ খৃষ্টাব্দে একটি সম্বৎ প্রচলন করেন। ইহা শকাব্দ নামে পরিচিত।

কণিষ্ক

কণিষ্ক অসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং বিভিন্ন দেশ জয় করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাশ্মীর অধিকার করেন এবং সকেত ও পাটলীপুত্রের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। তিনি পার্থিয়ার রাজাকে পরাজিত করেন। চীন সম্রাটকে পরাজিত করিয়া তিনি কাসগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ জয় করেন। কিন্তু পরে চীন সম্রাট হো-তির রাজত্বকালে চীনা সেনাপতি পান চাও-এর নিকট কণিষ্ক পরাজিত হন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কয়েক বৎসর পর কণিষ্ক পামীর অতিক্রম করিয়া চীন আক্রমণ করেন এবং পান-চাও-এর পুত্রকে পরাজিত করিয়া চীন সম্রাটের এক পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ নিজ রাজসভায় লইয়া আসেন।



কণিষ্ক

ভারতের বাহিরে আফগানিস্থান, কাসগড়, খোটান এবং ইয়ারখন্দ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু এবং উত্তর প্রদেশে বারাণসী পর্যন্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বিহার এবং বাংলাদেশেও কণিষ্কের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ভারতে তাহার সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ শাসন করিবার জন্য তিনি মহাক্ষত্রপ ও ক্ষত্রপ উপাধিধারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি



কণিষ্কের মুদ্রা

কণিষ্কের ধর্মমত ঃ মুদ্রা, লিপি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে, সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরেই কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অনেক মুদ্রায় বুদ্ধের প্রতিকৃতি অংকিত দেখা যায়। পেশোয়ার বা পুরুষপুরে তিনি একটি বিশাল বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করেন। ইহার উপরিভাগে নির্মিত গম্বুজের মধ্যে বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল। তিনি জলন্ধর (কাশ্মীর) বা গান্ধারের এক বৌদ্ধ সংগীতি বা সম্মেলন আহ্বান করেন। সুপণ্ডিত বসুমিত্র এবং অশ্বঘোষ এই সভার কার্য পরিচালনা করেন। এই অধিবেশনে বৌদ্ধ ধর্মমতসমূহের ব্যাখ্যা একটি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করিয়া একটি স্তূপে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার মুদ্রায় হিন্দু, গ্রীক, পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবীর মূর্তি অংকিত দেখা যায়। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়া ও চীনে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি মহাযান মতের সমর্থক ছিলেন।

বৌদ্ধ সংগীতি

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ কণিষ্ক শিল্প ও সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি পেশোয়ারে বিরাট বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করেন। এজিসিলাওস্ নামক একজন গ্রীক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এই মঠ নির্মিত হইয়াছিল। তিনি তক্ষশিলার নিকট একটি নগর নির্মাণ করান। কাশ্মীরের অন্তর্গত কণিষ্কপুর নগরী তিনি স্থাপন করেন। যে সকল মনীষী তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক, পার্শ্ব এবং নাগার্জুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি মথুরায় সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া ইহাকে সুশোভিত করেন। মথুরায় কণিষ্কের একটি সুন্দর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তিনি সাহিত্যেরও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্নতি

কুষাণ যুগে গান্ধার শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কুষাণ যুগে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্প গড়িয়া উঠে তাহাতে গ্রীক ও রোমান প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ বিষয়সমূহে গ্রীকশিল্পের কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া নূতন শিল্পের সৃষ্টি হয়। ইহাই গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত। মহাযান বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার যে প্রচলন হয় তাহার ফলে গ্রীকরীতি ও কলাকৌশল অনুযায়ী বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হইতে থাকে।

গান্ধার শিল্প

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ঃ কুষাণ যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্য-এশিয়ায় প্রচার লাভ করে। কুষাণ যুগেই বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। কণিষ্কের সময় বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইবার ফলে ইহা বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সংস্পর্শে আসে। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্মে অনেক পরিবর্তন হয় এবং বৌদ্ধধর্মে মহাযান মতের উদ্ভব হয়। নাগার্জুন, বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ এই ধর্মমতের অনুগামী ছিলেন। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়।

মহাযান মতের পৃষ্ঠপোষকতা

কণিষ্কের উত্তরাধিকারিগণ ঃ কণিষ্কের পর বসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক এবং বাসুদেব যথাক্রমে রাজত্ব করেন। ইহাদের কোন বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কুষাণ সাম্রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। পারস্যের সাসানীয় সম্রাটগণ ব্যাক্ট্রিয়া, আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করিয়া লন। কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত সম্রাটগণ সাসানীয়দের নিকট হইতে এই সকল অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কুষাণগণকে হুণ ও মুসলমানদের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। খৃষ্টীয় নবম শতকে কুষাণগণ হিন্দুশাহী রাজগণ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়।

হুণ আক্রমণ (Hun Invasion) ঃ গুপ্ত সম্রাটগণের সময় হুণগণ ভারত আক্রমণ করে, কিন্তু স্কন্দগুপ্ত ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলে তোরমান-এর নেতৃত্বে হুণগণ পুনরায় গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লয়। ৫১০ খৃষ্টাব্দে তোরমান গুপ্ত সম্রাট ভানুগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তোরমান-এর পর তাঁহার পুত্র মিহিরকুল হুণ জাতির নেতৃত্ব

গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মান্দাশোরের রাজা যশোধর্মনের নিকট পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হূণগণ ক্রমশঃ

তোরমান ও মিহিরকুল



হূণ মুদ্রা

দুর্বল হইয়া পড়ে। অবশেষে হূণগণ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশিয়া যায়।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব ঃ মৌর্যোত্তর যুগে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিবার ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। মৌর্যযুগের পতনের পর হইতে গুপ্তযুগের অভ্যুদয় পর্যন্ত ভারতে স্থাপত্যশিল্প ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, মথুরা, গান্ধার, অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। গুপ্তরাজগণের সময়ে ভারতে নির্মিত স্তূপ, বুদ্ধ-গয়ার মন্দির, অশোকের সময়ে নির্মিত সাঁচীর স্তূপ, মথুরায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি ও কুষাণরাজের মূর্তি, গান্ধার অঞ্চলে প্রাপ্ত অসংখ্য বুদ্ধ মূর্তি এবং অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার স্তূপ এই যুগের স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন। কুষাণরাজদের আমলে গান্ধার শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে কুষাণগণের পতনের সময় পর্যন্ত ভারতে বহু ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সুপণ্ডিত ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান সমর্থক ও প্রচারক নাগার্জুন এবং ভেষজ ও চিকিৎসাবিদ জীবক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পাণিণি এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাকার পতঞ্জলিও এই যুগের মনীষীবৃন্দের অন্যতম। বিখ্যাত কাহিনীকার গুণাঢ্য এবং ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত চরক এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন। অস্ত্র চিকিৎসক সুশ্রুত, বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত অশ্বঘোষ এবং কাত্যায়ন এই যুগের মনীষিবৃন্দের অন্যতম।

নাগার্জুন জীবক, পাণিনি, পতঞ্জলি, চরক ইত্যাদি

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত তক্ষশিলা ছিল ভারত এবং এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন দেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইতেন। ইহা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কলা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন ভেষজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অবৈতনিক। রাজা সম্রাটগণের অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হইত।

তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়

মৌর্যোত্তর যুগে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নেপাল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, মধ্য-এশিয়া ও চীনের সহিত ভারতের দীর্ঘদিন ধরিয়া যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কুষাণগণ আফগানিস্থানের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাহারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি স্থানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারত ও মধ্য-এশিয়ায় একাংশ একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। কুষাণগণ মধ্য-এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। ডাঃ অরেলস্টাইন মধ্য-এশিয়ার বালুকারাশির নীচে যে সকল বৌদ্ধ-স্তূপ, বুদ্ধমূর্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও যে সকল লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, খোটান এবং মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিত।

বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ ও উপনিবেশ বিস্তার

ভারতের সহিত চীনের দীর্ঘদিনের গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া এবং সমুদ্রপথে ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্য চলিত। কুষাণ যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। এই ধর্মমতের প্রচারকগণ চীনে এবং মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছিলেন। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করিবার ফলে চীন হইতে অনেক পরিব্রাজক ভারতে আসিতেন এবং ভারতের সহিত চীনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কণিষ্কের সহিত চীন সম্রাটের কয়েকবার যুদ্ধ হইলেও ভারতের সহিত চীনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয় নাই।

চীনের সহিত যোগাযোগ

মৌর্যোত্তর যুগে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন রাজা ও সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। সম্রাট কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পূর্বে গ্রীকরাজ মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কণিষ্ক মধ্য-এশিয়া ও চীনে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। এই যুগ ছিল মহাযান

ভারতের বাহিরে ধর্মপ্রচার

ধর্মমতের যুগ। মধ্য-এশিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। চীন সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে গমন করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। চীন সম্রাটের আদেশে রাজধানীতে বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য একটি বিহার নির্মিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এই সকল অঞ্চলে প্রচার লাভ করে।

মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। এই যুগে শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি ভারতে আগমন করে এবং এই দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে তাহারা হিন্দুসমাজের সহিত মিশিয়া যায়। তাহারা হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিবাহপদ্ধতি ও ভাষা গ্রহণ করে। ইহার ফলে হিন্দুসমাজে বৈদেশিকগণ প্রবেশ লাভ করে। এই যুগে বৈদেশিকদের আগমনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায়ও জটিলতা দেখা দেয় এবং ভারতীয়গণ পূর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল হইয়া পড়ে। সমাজে নারীর স্বাধীনতা অনেক কমিয়া যায়।

সামাজিক অবস্থা

রাজপুতদের উৎপত্তিঃ হিন্দুযুগ ও মুসলমান যুগের ইতিহাসে রাজপুতগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজপুতদের উৎপত্তি লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ওঝা, বৈদ্য প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতে রাজপুতগণ সূর্য ও চন্দ্রবংশ হইতে উদ্ভূত। প্রতিহারগণ তাহাদের লিপিতে নিজেদের রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণ বংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। ঐতিহাসিক টড্ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে রাজপুতগণ বহিরাগত শক, হুণ, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি হইতে উদ্ভূত। এই সকল বৈদেশিক জাতিগুলি কালক্রমে হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া যায়। কালক্রমে রাজপুতগণ ভারতে একাধিক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। মুসলমানগণের ভারত বিজয়ের সময় পর্যন্ত উত্তর ভারতের অনেকগুলি রাজ্য রাজপুতগণ কর্তৃক শাসিত হইত। ভারতে মুসলমান শক্তির বিস্তারের বিরুদ্ধে ইহারা মরণপণ সংগ্রাম করিয়াছিল। এই সকল রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ, মধ্যভারতের চেদী বা কলচুরি বংশ, দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশ, মালবের পরমার বংশ, গুজরাটের চালুক্য বংশ, কনৌজের গহড়বাল বংশ এবং শক্তিশালী গুর্জর-প্রতিহার বংশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগ (Age of Imperial Unity)

মগধের অভ্যুদয় ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য

মগধের অভ্যুত্থান ঃ হর্যঙ্ক-শিশুনাগ বংশ ঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধের রাজা ছিলেন হর্যঙ্ক-বংশের বিম্বিসার। তাঁহার অধীনে মগধের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁহার রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। পরে তিনি গিরিব্রজ হইতে রাজগৃহে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি গান্ধার ও অবন্তীর রাজার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। বৈশালী, মদ্র এবং কোশলের রাজবংশগুলির সহিত তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

বিম্বিসার

কোশলের রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার ফলে তিনি কাশী রাজ্যের একাংশ যৌতুক স্বরূপ পান। বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার ফলে উত্তর দিকে মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তারের পথ সুগম হয়। তিনি অঙ্গরাজ্য জয় করেন এবং অঙ্গ মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি কঠোর হস্তে রাজ্যশাসন করিতেন এবং কর্মচারীদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বুদ্ধ বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন। বিম্বিসার প্রায় আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

বিম্বিসারের পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। তিনি কুণিক নামেও পরিচিত ছিলেন। অজাতশত্রু তাঁহার পিতার রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করিয়া রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। কোশল্‌রাজ প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। অজাতশত্রু বিবাহের যৌতুক স্বরূপ কাশীরাজ্যের একাংশ পান। ইহার পর তিনি বৈশালীর বৃজি ও পাবার মল্লগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তিনি বৈশালী অধিকার করেন। তাঁহার ক্ষমতা অবনতি ঘটে। অজাতশত্রুর সময় মগধ উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

অজাতশত্রুর পর তাঁহার পুত্র দারাশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর তাহার পুত্র উদয়িন মগধের রাজা হন। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুযায়ী

উদয়িন ছিলেন অজাতশত্রুর পুত্র। তিনি অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদয়িন কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

উদয়িন
শিশুনাগ, কালাশোক

এই বংশের শেষ রাজা নাগদাশোককে নিহত করিয়া মন্ত্রী শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবন্তীরাজ্য অধিকার করেন এবং ইহা মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। শিশুনাগের পর কালাশোক বা কাকবর্ণিন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার সময় বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহুত হয়। তিনি বৎস রাজ্য অধিকার করেন। নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মের হস্তে তিনি নিহত হন।

নন্দবংশ (Nanda Dynasty) ঃ পুরাণ অনুযায়ী মহাপদ্ম (উগ্রসেন) শূদ্র মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তাঁহার মাতা ছিলেন গণিকা এবং পিতা ছিলেন ক্ষৌরকার। গ্রীক ঐতিহাসিক

মহাপদ্মনন্দ

কার্টিয়াসের মত অনুযায়ী শিশুনাগবংশের রাণীর সহায়তায় তিনি রাজা এবং সকল রাজপুত্রগণকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ঘৃণ্য উপায়ে সিংহাসন হস্তগত করেন। কিন্তু তিনি অসামান্য ক্ষমতাশালী ছিলেন। মহাপদ্ম কলিঙ্গ এবং কোশল অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ

রাজ্য বিস্তার

দাক্ষিণাত্যের কুন্তল ও অশ্মক রাজ্যও অধিকার করেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে তাঁহার রাজ্যসীমা বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। ঐতিহাসিক যুগে মহাপদ্ম নন্দই প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী।

মহাপদ্মের মৃত্যুর পর তাঁহার আট পুত্র যথাক্রমে মগধে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সময়ে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে তিনি একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি ধনলিপ্স ও

শেষ রাজা ধননন্দ

অত্যাচারী শাসক ছিলেন, এইজন্য প্রজাবর্গের মনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই অসন্তোষ ও ঘৃণার সুযোগ লইয়া মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য (Maurya Empire)

বংশ পরিচয়

চন্দ্রগুপ্ত (**Chandragupta**) ঃ মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা (অনেকের মতে মাতামহী) মুরা ছিলেন শূদ্রাণী এবং নন্দরাজের উপপত্নী (বা পত্নী)। তাঁহার নামানুসারেই চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হইয়াছে মৌর্যবংশ। কিন্তু নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধগ্রন্থ অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ক্ষত্রিয়। পিপ্পলিভনে মোরিয় নামক এক ক্ষত্রিয় বংশ রাজত্ব করিত। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন এই মোরিয় বংশের সন্তান। চন্দ্রগুপ্তের বাল্যকালে মোরিয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

গ্রীক শিবিরে গমন ও পলায়ন

চাণক্যের সাহায্যলাভ

মগধ অধিকার

গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দের সময় তাঁহার অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহার সুযোগ লইয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিতে মনস্থ করেন। গ্রীকদের সাহায্য লাভের আশায় তিনি আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপনীত হন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের শিবির হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এই সময় চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামক তক্ষশিলার এক সুচতুর ব্রাহ্মণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ হয়। চাণক্য নন্দরাজ কর্তৃক অপমানিত হইয়া প্রতিশোধের উপায় খুঁজিতেছিলেন। উভয়ে মিলিয়া এক সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজাকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন (খৃঃ পূঃ)। অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাবের গ্রীকগণকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ৩১৭ খৃঃ পূর্বাব্দে গ্রীক সেনাপতি ইউডিমাস ভারত ত্যাগ করিলে ভারতে গ্রীক রাজত্বের অবসান হয়।

চন্দ্রগুপ্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। মালব, সৌরাষ্ট্র, কাবুল উপত্যকা এবং সম্ভবতঃ মহীশূরের কিয়দংশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি **সেলিউকস** ভারতের পূর্বতন গ্রীক-অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সেলিউকস কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও

মাকরান চন্দ্রগুপ্তকে সমর্পণ করেন। বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসকে পাঁচশত হস্তী উপহার প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামক একজন দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, তিনি পরিণত বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং জৈনধর্মের প্রথা অনুযায়ী মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণগোলায় অনশনে দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক ৩৯৮-৩৯৬ খৃঃ পূঃ)।

সেলিউকসের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপন

চন্দ্রগুপ্তের অসাধারণ প্রতিভার জন্য তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেলিউকসের ন্যায় বিখ্যাত সেনাপতির সহিত যুদ্ধে সাফল্য অর্জন তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচয়। প্রাচীন ভারতে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিশাল সাম্রাজ্য আর কেহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। শাসন ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে একই প্রকার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা এবং শাসনব্যবস্থার সাফল্য, শাসক হিসাবে তাহার কৃতিত্বের পরিচয়।

সাম্রাজ্য স্থাপন
সুশাসক

বিন্দুসার (Bindusara) ঃ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার 'অভিমত্রঘাত' (শত্রুনিধনকারী) উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ হয়। যুবরাজ অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন। গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত তিনি সৌহার্দ্য বজায় রাখেন। সিরিয়ার রাজা সেলুকসের পুত্র এন্টিওকস্ তাঁহার রাজসভায় ডেইমেকস নামে একজন দূত প্রেরণ করেন। মিশরের রাজা টলেমি ফিলাডেলফস্, ডায়োনিসাস্ নামক একজন দূত তাঁহার সভায় প্রেরণ করেন। তিনি প্রায় আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। (আনুমানিক ৩০০-২৭৩ খৃঃ পূঃ)।

অশোক (Asoka) ঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর ২৭৩ খৃঃ পূর্বাব্দে তাঁহার পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু চার বৎসর পর ২৬৯ খৃঃ পূর্বাব্দে তাঁর অভিষেক হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ লইয়া বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় অভিষেক ক্রিয়া চারি বৎসর পরে হইয়াছিল। অভিষেকের আট বৎসর পরে (খৃঃ পূঃ ১৬১) অশোক কলিঙ্গবিজয়ে বহির্গত হন। কলিঙ্গ অশোকের সময় একটি পরাক্রমশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

কিন্তু কলিঙ্গ-বাসীরা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াও অশোকের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। অশোকের শিলালিপিতে আমরা এই যুদ্ধের ভয়াবহ বিবরণ পাই। এই যুদ্ধে প্রায় একলক্ষ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল।

কলিঙ্গ যুদ্ধ

কলিঙ্গ যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এযাবৎ মগধরাজগণ কর্তৃক অনুসৃত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য জয় করিবার নীতি পরিত্যক্ত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ রক্তপাতের দৃশ্য, আহতদের বেদনা, আর্তের ক্রন্দন এবং জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা অশোকের মনে গভীর অনুতাপ ও অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর যুদ্ধ করিবেন না। দিগ্বিজয়ের যুগ শেষ হইল, ধর্ম বিজয়ের যুগ আরম্ভ হইল। অশোক সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার দ্বারা মানবহৃদয় জয়ের আদর্শ গ্রহণ করিলেন।

অশোকের পরিবর্তন



সম্রাট অশোক

অশোকের ধর্ম ও ধর্মনীতিঃ কলিঙ্গযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী দৃশ্য দেখিয়া অশোকের মনে যে পরিবর্তন আসে তাহার ফলে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার সংকল্প করেন। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি উপগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া লুম্বিনী উদ্যান, কপিলাবস্তু, সারনাথ, শ্রাবস্তী, গয়ার বোধিবৃক্ষ, কুশীনগর প্রভৃতি বৌদ্ধদের পবিত্র স্থানসমূহ ভ্রমণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের জন্য তিনি স্তম্ভ ও স্তূপ নির্মাণ করিয়া এবং পর্বত-গাত্রে বুদ্ধের বাণী সহজ ভাষায় লিখিয়া দিতেন। দেশান্তরে বুদ্ধের বাণী প্রচার করিবার জন্য ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম এবং সংঘের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য অশোক পাটলীপুত্রে বৌদ্ধ সংগীতি বা সম্মেলন (তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি) আহ্বান করেন। ইহার ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য দূর হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ সংঘ হইতে অনাচার দূরীভূত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্মস্থান সমূহ ভ্রমণ

বৌদ্ধধর্ম প্রচার, তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি

অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার ধর্মনীতির উদারতা দেখা যায়। কোন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা, ধর্মের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি তিনি অধিক জোর দিয়াছিলেন। কয়েকটি ব্যবহারিক নীতির প্রবর্তন করিয়া মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন। পিতামাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করা, সত্যবাদিতা এবং সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ইহাই অশোকের ধর্মের মূল কথা। দয়া, দান, শুচিতা, সততা, অহিংসা, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি এই কয়টি নীতির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অহিংসা ছিল অশোকের ধর্মের মূল নীতি। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর তিনি মৃগয়া বন্ধ করিয়া দেন। প্রাণী-হত্যা নিষিদ্ধ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পরও তিনি নিজেকে 'দেবানামপ্রিয় প্রিয়দর্শিন' (দেবতাদের প্রিয়) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কয়েকটি ব্যবহারিক নীতির প্রবর্তন

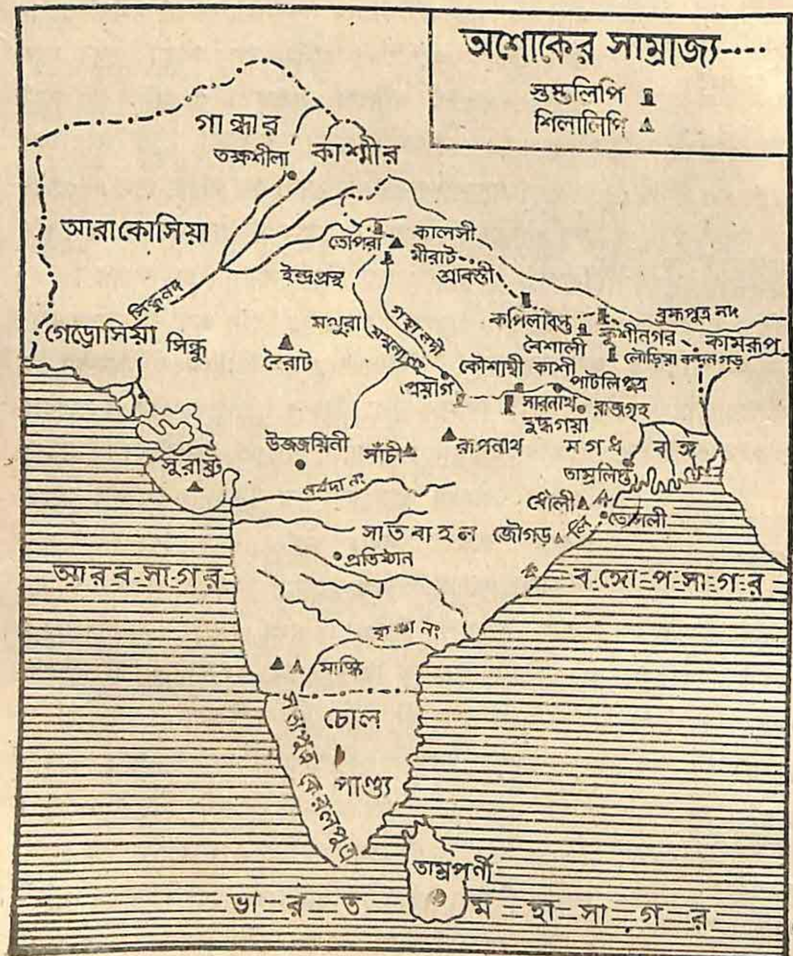
প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ

অশোকের ধর্মপ্রচার (Missionary activities of Asoka) ঃ অশোক নিজে বৌদ্ধধর্মবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ধর্ম হইতে বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল। দেশে-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিহার যাত্রার পরিবর্তে ধর্মযাত্রা আরম্ভ করেন। ধর্মসভা আহ্বান করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। ধর্ম সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করিবার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্নস্থানে পর্বতগাত্রে, প্রস্তরখণ্ডে, স্তূপ ও স্তম্ভে ধর্মের মূল কথাগুলি উৎকীর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ধর্মের অনুশাসনগুলি যাহাতে জনসাধারণ মানিয়া চলে তাহার জন্য অশোক ধর্মমহামাত্র নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। ইহারা বুদ্ধের বাণী প্রচার করিত এবং বিশেষভাবে প্রাণী-হত্যার বিরুদ্ধে অশোকের নির্দেশ যাহাতে ঠিকভাবে প্রতি-পালিত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিত। যুত, রাজুক, মহা-মাত্র প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণ শাসনকার্যের সহিত ধর্মপ্রচার করিত। অশোকের নির্দেশ অনুযায়ী রাজকর্মচারিগণকে বৎসরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের ধর্মের নীতিকথা বুঝাইয়া দিতে হইত। প্রজাদের তিনি সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাহাদের সুবিধার জন্য তিনি কূপ খনন, সরাইখানা নির্মাণ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয়

ধর্মযাত্রা, ধর্মসভা, ধর্মলিপি, ধর্মমহামাত্র

রাজকর্মচারী, জনকল্যাণমূলক কার্য

স্থাপন, ও দরিদ্র অসহায়ের সাহায্যের জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্যে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। এই সকল জনহিতকর কার্য শুধু নিজ সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বিদেশেও এই সকল জনহিতকর কার্য করাইয়াছিলেন।



অশোক শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই ধর্মপ্রচার সীমাবদ্ধ রাখেন নাই; বিদেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজ্যসমূহেও তিনি ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। অশোক তাঁহার পুত্র (অনেকের মতে ভ্রাতা) মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রেরিত ধর্ম-

বিদেশে ধর্মপ্রচার

প্রচারক ও দূতগণ সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন ও এপিরাসের রাজসভায় সমাদৃত হইয়াছিলেন।

অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ অশোকের সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় এন্টিয়কসের রাজ্যসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমান বেলুচিস্থান, সিন্ধুপ্রদেশ এবং আফগানিস্থান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাম্বোজ এবং গান্ধার রাষ্ট্রদ্বয় তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ছিল। কাশ্মীর এবং নেপালের তরাই অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বদিকে তাঁহার সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতে তাঁহার সাম্রাজ্য পেনার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্ধ্র, ভোজ, পুলিন্দ এবং রাষ্ট্রিকদের রাজ্যগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য ছিল। পশ্চিমে অশোকের সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অশোকের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievements of Asoka) ঃ অশোক সর্বকালের এবং সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটগণের অন্যতম। প্রজাদের তিনি নিজের সন্তানের ন্যায় মনে করিতেন এবং তাহাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি মূলতঃ ছিলেন শান্তিবাদী সম্রাট। ধর্মমত পরিবর্তনের ফলে তিনি দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের পথ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের "ভেরীঘোষ" "ধর্মঘোষ"-এ রূপান্তরিত হয়। তিনি যুদ্ধের পথ পরিহার করিয়া ধর্মের দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করিতে সচেষ্ট হন।

ধর্ম বিজয়

তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ধর্ম হইতে বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন, তাঁহার ধর্মে গোঁড়ামি ছিল না। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। যে নীতিকথা তিনি প্রচার করিতেন বাস্তব জীবনে তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। ইহা তাঁহার আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পরিচয়। প্রজাগণের নৈতিক এবং পার্থিব উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত এবং বিরামহীন চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মধ্যে সন্ন্যাসী জীবনের পবিত্রতা এবং রাজার উপযুক্ত জ্ঞান, মহত্ত্ব ও উন্নত আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছিল।

আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা

ইতিহাসে অশোকের স্থান (Asoka's Place in History) ঃ ইতিহাসে অশোক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিরাট

সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি রক্তাক্ত সংগ্রামের দ্বারা রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করেন নাই। ন্যায় ও ধর্মের পথে মানুষের হৃদয় জয় করিতে মনোনিবেশ করেন। একটিমাত্র যুদ্ধের ভয়াবহ ও বীভৎস দৃশ্য তাঁহার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দেয়। তিনি চিরকালের জন্য যুদ্ধের পথ পরিহার করেন। ইহার পর হইতে তিনি জনসাধারণের নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতির জন্য অকাতরে রাজকোষ হইতে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, প্রজাসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের মধ্যে রাজার সত্যিকার গৌরব এবং কৃতিত্ব নিহিত। পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা তাঁহার ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অহিংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক

আলেকজাণ্ডার, কনস্টান্‌টাইন, শার্লামেন, নেপোলিয়ন, আকবর প্রভৃতি নৃপতিগণের ন্যায় অশোকও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছেন। কিন্তু ইতিহাসে অশোকের স্থান স্বতন্ত্র। মানবপ্রেম, সর্বজীবে দয়া, অহিংসা এবং বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা তিনি জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত অশোকের পার্থক্য হইল এইখানে।

স্বশাসক হিসাবেও পৃথিবীর অন্যান্য সম্রাটগণের মধ্যে অশোক অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াও তিনি দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং প্রজাবর্গের সুখ, শান্তি ও উন্নতি বিধান করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন 'সকল মানুষই আমার সন্তান'। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী সম্রাট। অশোকের সময়ে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে নির্মিত সুন্দর স্তূপ, স্তম্ভ এবং চৈত্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন। পৃথিবীর ইতিহাসে শতসহস্র নৃপতিগণের মধ্যে অশোকের নাম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

স্বশাসক

অশোকের উত্তরাধিকারিগণ ঃ সম্ভবতঃ ২৩২ খৃঃ পূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। তাহার পর সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র **কুনাল** সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুনাল ব্যতীত জলৌক ও তিভারা অশোকের পুত্র ছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে দশরথ, সম্প্রতি ও বিগতাশোকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন **বৃহদ্রথ**। তাহাকে নিহত করিয়া সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

গুপ্ত বংশ (Gupta Dynasty) ঃ গুপ্ত সম্রাটগণের উৎপত্তি সম্পর্কে

বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত মগধের এক ক্ষুদ্র অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তিনি 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে ইহারা স্বাধীন রাজা ছিলেন, না অন্য কোন সম্রাটের সামন্ত ছিলেন, তাহা সঠিক বলা যায় না।

গুপ্ত, ঘটোৎকচ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (Chandragupta I) ঃ ঘটোৎকচের পর তাঁহার পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ ৩৩০ খৃষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশের ও বাংলাদেশের কিয়দংশের উপর চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্ত (Samudragupta) ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩২০ খৃষ্টাব্দের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সভাকবি ও বন্ধু হরিষেণ যে প্রশস্তি রচনা করিয়া এলাহাবাদে স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার বিভিন্ন রাজ্যজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। এই লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি উত্তর ভারতের নয়জন রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা হইলেন গণপতিনাগ, নাগসেন, নন্দী, রুদ্রদেব, মতিল, চন্দ্রবর্মণ, বলবর্মণ, অচ্যুত ও নাগদত্ত। তিনি গাজীপুর-জব্বলপুরের অরণ্য অঞ্চলের রাজ্যসমূহও অধিকার করেন। উত্তর ভারতের প্রায় অধিকাংশ রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উত্তর ভারত বিজয়



সমুদ্রগুপ্ত

উত্তর ভারত বিজয়ের পর তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। দক্ষিণ ভারত অভিযান তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতে তিনি কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। যে সকল রাজাকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোশলের মহেন্দ্র,

মহাকান্তরা'র ব্যাঘ্ররাজা, কোত্তুরা'র স্বামীদত্ত, কৌরালা'র মন্তরাজা, কাঞ্চী'র বিষ্ণুগোপ, এরণ্ডপালা'র দমন, ভেঙ্গী'র হস্তীবর্মণ, দেবরাষ্ট্রে'র কুবের, পিষ্ঠাপুর-এর মহেন্দ্রগিরি, পালাক্কা'র উগ্রসেন, কুস্থলাপুরের ধনঞ্জয় এবং অভমুক্তার নীলরাজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের বিজিত রাজ্যগুলিকে তিনি নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। বিজিত রাজ্যসমূহের রাজাদের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ লইয়া তাঁহাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

দক্ষিণ ভারতে অভিযান



সমুদ্রগুপ্তের এই বিজয়-অভিযান সংবাদে ভীত হইয়া পূর্বভারতের সমতট, কামরূপ, দাভাক, নেপাল ও কার্তিপুরের শাসকগণ এবং পশ্চিম ভারতের

মালব, অর্জুনায়ন, যুদেহ, মদ্রক, আভির প্রভৃতি উপজাতি ও গোষ্ঠীসমূহের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যসমূহ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া করপ্রদানে সম্মত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও গুজরাটের শক শাসকগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। এই দিগ্বিজয়ের ফলে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সীমান্ত রাজ্যসমূহের আনুগত্য স্বীকার

সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি ভারতের বাহিরেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মালয়, যবদ্বীপ ও সুমাত্রার হিন্দু উপনিবেশগুলির উপর সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। সিংহলের রাজা মেঘবর্মণ বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিবার অনুমতি চাহিয়া সমুদ্রগুপ্তের নিকট প্রচুর উপঢৌকনসহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Samudragupta) ঃ মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর সমুদ্রগুপ্ত ভারতে এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে পরাজিত করিয়া তিনি যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার নিদর্শন। ঐতিহাসিক ডাঃ স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে পরাজিত করিলেও সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নহে। এইজন্য তিনি তাহাদের আনুগত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী, সুকবি, সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে হরিষেণ তাঁহাকে 'কবিরাজ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বর্ণমুদ্রায় খোদিত বীণা বাদনরত মূর্তি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী হইলেও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বহুবিধ গুণাবলীর জন্য সমুদ্রগুপ্ত ভারতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মধ্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছেন।

ভারতের নেপোলিয়ন, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি

বিদ্যোৎসাহী

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (Chandragupta II ; Vikramaditya) ঃ সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার অন্যতম পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের

সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মধ্যভারতের প্রতাপশালী নাগরাজবংশের এক রাজকন্যাকে নিজে বিবাহ করেন এবং বাকটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রদমনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন। তিনি পশ্চিম ভারতের (মালব ও সৌরাষ্ট্র) শক রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সমুদ্রোপকূলের কয়েকটি বন্দর হস্তগত হওয়ায় সাম্রাজ্যের আর্থিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁহার সময়ে ভারতে আগমন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। শকগণকে পরাজিত করিয়া তিনি সম্ভবতঃ 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

সাম্রাজ্যের বিস্তার

কালিদাস প্রমুখ নয়জন মনীষী তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহারাই 'নবরত্ন' নামে খ্যাত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একজন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজসভা এক বিরাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ধর্মমত সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিতেন।

নবরত্ন, ধর্মমত

প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (Kumargupta I : Mahendraditya) ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪১৫-৪৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি নূতন কোন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। তবে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে নর্মদা উপত্যকার পুষ্যমিত্র উপজাতিগণের আক্রমণে সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্রগণকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যের পতন রোধ করেন।

স্কন্দগুপ্ত ঃ বিক্রমাদিত্য (Skandagupta : Vikramaditya) ঃ গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খৃঃ)। তাঁহার সময়ে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ হূণ জাতি দুর্বার গতিতে ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু তিনি হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। তিনি যখন

সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পুষ্যমিত্র উপজাতির সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। তাঁহার বীরত্বের ফলে পুষ্যমিত্রগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু সকল ধর্মের প্রতি সমান উদারতা প্রদর্শন করিতেন।

হূণ আক্রমণ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন (Downfall of the Gupta Empire) ঃ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত, বৈন্যগুপ্ত, ভানুগুপ্ত এবং বিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তরাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় হূণগণ মিহিরকুলের নেতৃত্বে ভারত আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তরাজগণের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Gupta Empire) ঃ প্রথমতঃ স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতা সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। বিরাট সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বজায় রাখার মত যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, পুষ্যমিত্রগণের আক্রমণ ও হূণদের বারংবার আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। স্কন্দগুপ্ত হূণদের আক্রমণ প্রতিহত করিলেও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পক্ষে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয় নাই। হূণগণ পশ্চিম ভারতের এক বিরাট অংশ দখল করিয়া লয়। তৃতীয়তঃ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উচ্চাভিলাষ গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত কবিয়াছিল। সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বাংলার গৌড়বংশ, বল্লভীর মৈত্রকগণ, মান্দাশোরের যশোবর্মণ এবং উত্তর প্রদেশের মৌখারীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। চতুর্থতঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত রাজগণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্তর্বিরোধের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, পরবর্তী গুপ্তরাজগণের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগের ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ

পুষ্যমিত্র ও হূণ আক্রমণ ; প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উচ্চাভিলাষ

অন্তর্বিরোধ ; বৌদ্ধধর্মানুরাগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক অনৈক্য (Political disunity after the downfall of the Gupta Fmpire) ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ভারতে একাধিক রাজ্যের ও রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ

হুণ জাতি ভারত আক্রমণ করিয়া গান্ধার ও পাঞ্জাব হইতে মালব পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অধিকার করিয়া লয়। কনৌজে মৌখারী বংশ, থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ, গৌড়ে শশাঙ্ক, বলভীর মৈত্রক বংশ' মান্দাশোরে যশোধর্মণ এবং কলিঙ্গে চেত বংশের অভ্যুদয় ঘটে।

পুষ্যভূতি বংশ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং হুণ আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তাহার সুযোগ লইয়া পুষ্যভূতিবংশীয়গণ থানেশ্বরে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। এই বংশের প্রথম তিনজন রাজা নরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন ও আদিত্যবর্ধনের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। এই বংশের চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রভাকরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সংবাদ পান যে মালবের গুপ্তরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়াধিপতি শশাংক কনৌজ আক্রমণ করিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি কনৌজরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছেন এবং ভগ্নী রাজ্যশ্রী তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। তিনি অবিলম্বে মালব রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন কিন্তু শশাংকের হস্তে নিহত হন।

হর্ষবর্ধন ঃ ৬০৬ – ৪৭ খৃঃ (Harshavardhana) ঃ রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর মন্ত্রীদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬০৬ খৃঃ)। এই বৎসর হইতে তিনি যে সম্বৎ প্রচলন করেন তাহা হর্ষাব্দ নামে পরিচিত। গ্রহবর্মার মৃত্যুর ফলে কনৌজের সিংহাসন শূন্য হইয়াছিল। কনৌজের মন্ত্রী ভাণ্ডী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণের অনুরোধে তিনি কনৌজের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।



হর্ষবর্ধন

থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্য দুইটিকে একত্র করিয়া হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন।

হর্ষ কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। হর্ষ ও ভাস্কর-বর্মণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শশাংক কনৌজ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য

ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা

হন। শশাংক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। শশাংকের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন মগধের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা অধিকার করেন। তিনি সৌরাষ্ট্রের বলভীরাজকেও পরাজিত করেন। বলভীরাজ ধ্রুবসেন হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হর্ষ সম্ভবতঃ সিন্ধুদেশ এবং কাশ্মীরেও অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাতাপির

পুলকেশীর নিকট পরাজয়

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের পূর্বাংশ, সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশের একাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দক্ষিণ দিকে তাঁহার সাম্রাজ্য নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হর্ষ কনৌজে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন।

হর্ষ প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চে ছিলেন তিনি নিজে। তাঁহাকে রাজকার্যে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। সমগ্র

শাসন ব্যবস্থা

সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ বা ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশ-গুলি কয়েকটি জেলায় বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। রাজকর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ভোগ করিত। উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। করভার লঘু ছিল। কিন্তু দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। সামান্য অপরাধে অর্থদণ্ড হইত, কিন্তু গুরুতর অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ করা হইত। দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও হর্ষের আমলে গুপ্ত যুগের অপেক্ষা অপরাধের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। কিন্তু হিউয়েন সাঙ্ ভারতীয় গণের চারিত্রিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

প্রথম জীবনে হর্ষ শৈব ছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি মহান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হইলেও হর্ষ শিব ও সূর্যের উপাসনা করিতেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

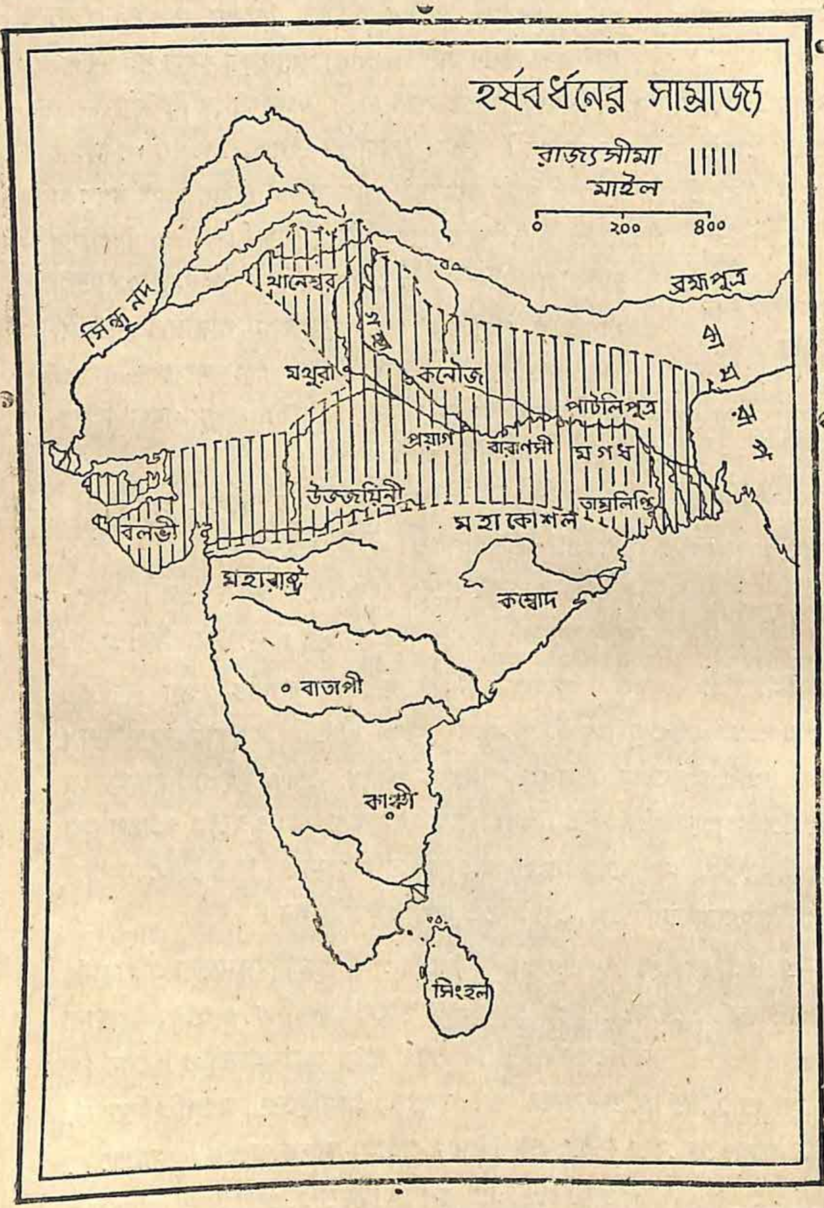
ধর্মমত

হর্ষ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন। তিনি কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যের

চরিত্র ও কৃতিত্ব

পতনের পর এবং হূণ আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তাহার অবসান করিয়া শান্তি ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের একজন

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এই যুগে উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান ছিল। হর্ষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একশতটি



গ্রাম দান করেন। তাঁহার দানশীলতার তুলনা বিরল। প্রয়াগের মেলায় সর্বস্ব দান করিয়া তিনি নিঃস্ব হইয়া যাইতেন।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের অবস্থা ঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কনৌজ সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু অল্পকাল পরেই গুর্জর প্রতিহার রাজগণ কনৌজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

গুর্জর-প্রতিহার বংশ (Gurjara Pratihara Dynasty) ঃ গুর্জরগণ সম্ভবতঃ হুণ জাতির একটি শাখা। হরিশচন্দ্র নামক জনৈক নেতার নেতৃত্বে ইহারা সর্বপ্রথম রাজপুতনায় বসতি স্থাপন করে।

৭২৫ খৃঃ গুর্জর-প্রতিহার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম নাগভট্ট। তিনি আরব আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরবর্তী পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০ খৃঃ)। তিনি বাংলার রাজা ধর্মপালকে

প্রথম নাগভট, বৎসরাজ

পরাজিত করেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হইয়া রাজপুতনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে রাষ্ট্রকূট, পাল এবং গুর্জর-প্রতিহার বংশের মধ্যে উত্তর ভারতের অধিকার লইয়া যে ত্রিদলীয় সংগ্রাম সুরু হয় তাহাতে শেষ পর্যন্ত গুর্জর-প্রতিহারগণই সাফল্য অর্জন করেন।

দ্বিতীয় নাগভট্ট

বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহার বংশের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি পালরাজ ধর্মপালের মনোনীত চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন এবং কনৌজে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া বাংলার সীমান্তে উপনীত হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট তিনি পরাজিত হন। নাগভট্টের পরবর্তী রাজা ছিলেন তাঁহার পুত্র রামভদ্র। রামভদ্রের পুত্র মিহিরভোজ ছিলেন প্রতিহার বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বাংলার পালরাজ দেবপালের নিকট পরাজিত হন।

মিহিরভোজ

দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে মিহিরভোজ মগধ আক্রমণ করিয়া পালরাজকে পরাজিত করেন। তিনি বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রাষ্ট্রকূট বংশের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বাংলার পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে সমগ্র উত্তর ভারতের বিরাট অংশে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। মিহিরভোজ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ভোজের পর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহেন্দ্র পাল

তাঁহার আমলে প্রতিহার সাম্রাজ্য গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়। তিনি বাংলার পালরাজা নারায়ণপালকে পরাজিত করিয়া মগধ

অধিকার করেন এবং উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। বিখ্যাত কবি রাজশেখর তাঁহার সভাকবি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই কনৌজের গৌরব অস্তমিত হয়। মহেন্দ্রপালের পর দ্বিতীয় ভোজ, মহীপাল এবং বিনায়কপাল যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের রাজা রাজ্যপাল সুলতান মামুদের আক্রমণ প্রতিহত না করিয়া পলায়ন করায় চন্দেল্ল রাজ কর্তৃক নিহত হন। এইভাবে গুর্জরপ্রতিহার বংশের অবসান ঘটে।

গৌড়ঃ শশাংকঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে একাধিক স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৌখারীরাজ ঈশানবর্মার সহিত গৌড়ের সংঘর্ষ হইয়াছিল। পরবর্তী গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের সময় গৌড় মগধ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর মগধে অরাজকতা দেখা দিলে শশাংক নামে এক ব্যক্তি স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলায়)। মালবের গুপ্তবংশের সহিত কনৌজের মৌখারী বংশের বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি পশ্চিমদিকে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। উভয়ে মৌখারীরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার স্ত্রী—(হর্ষবর্ধনের ভগ্নী) রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন ভগ্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হন। তিনি দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু শশাংকের হস্তে নিহত হন। শশাংক কনৌজ অধিকার করিলেও ইহার উপর তিনি দীর্ঘদিন আধিপত্য বজার রাখিতে পারেন নাই। রাজবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া শশাংকের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু শশাংকের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ শশাংক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ৬১৯ হইতে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাজ্য গঞ্জাম (উড়িষ্যা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা

শশাংকের কনৌজ অধিকার

শশাংকের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হইয়াছিল। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন হিউয়েন সাঙ্ বাংলা দেশে আসেন, তখন তিনি চারিটি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব দেখিতে পান। বাংলা-দেশে কোন কেন্দ্রীয় রাজশক্তি না থাকায় সমস্ত দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলার

সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অবস্থাকে 'মাৎস্য-ন্যায়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জনসাধারণের জীবন ও ধনসম্পত্তির কোন নিরাপত্তা ছিল না। সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিত। অভিজাতগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাতন্ত্র চালাইতেছিলেন। এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বাংলাদেশের সামন্তগণ ও জনসাধারণ গোপাল নামক এক জন সামন্তকে বাংলার রাজপদে নির্বাচিত করেন।

পালবংশ (Pala Dynasty) : গোপালের প্রতিষ্ঠিত বংশকে পালবংশ বলা হয়। গোপালের পূর্বপুরুষগণ কোন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত কিনা তাহা জানা যায় নাই। পালরাজগণ তাহাদের লিপিতে নিজেদের সূর্যবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। অবশ্য আবুল ফজল তাঁহাদের কায়স্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

গোপাল (Gopal) : ৭৫০-৭৭০ খৃঃ পর্যন্ত গোপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানা যায় নাই। তিনি নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ধর্মপাল (Dharamapala) : গোপালের পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে পালবংশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়। ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। প্রতিহার রাজ বৎসরাজ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট এবং রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দ তাহার সমসাময়িক ছিলেন। কনৌজ ও উত্তর ভারতের অধিকার লইয়া পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে এক ত্রিদলীয় সংগ্রাম আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত প্রতিহারগণই সাফল্য অর্জন করে। ধর্মপাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে পশ্চিমদিকে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান। চক্রায়ুধের অভিষেক অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহারা ধর্মপালের প্রাধান্য স্বীকার করিরা লইয়াছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিহার-রাজ বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইয়া বৎসরাজ রাজপুতনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। নবম শতাব্দীর

ত্রিদলীয় সংগ্রাম

শেষভাগে দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহার রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের রাজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া কনৌজ-আক্রমণ করেন। তিনি চক্রায়ুধকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া কনৌজে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পর নাগভট্ট বাংলাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া মুঙ্গেরের নিকট ধর্মপালকে পরাজিত করেন। নাগভট্টের বিজয় অভিযান বাংলাদেশে বিপর্যয় ঘটাইত; কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সসৈন্যে উত্তর ভারতে অগ্রসর হন এবং দ্বিতীয় নাগভট্টকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। ইহার ফলে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং ধর্মপাল উত্তর ভারতে তাঁহার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপাল বিক্রমশীলার বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করান। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিহার-রাজের নিকট নাগভট্টের পরাজয়

দেবপাল (Devapala)ঃ ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার সেনাপতি লাউসেন কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ কম্বোজ ও হূণদিগকে পরাজিত করেন। প্রতিহার-রাজ মিহিরভোজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তিনি দাক্ষিণাত্যের একটি দ্রাবিড় রাজশক্তিকে পরাজিত করেন। অনেকের মতে তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষকে পরাজিত করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন দেবপাল পাণ্ড্য-রাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভকে পরাজিত করেন। যাহা হউক একাধিক সামরিক অভিযানের ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের বাহিরেও দেবপালের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাভা, সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বলপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দেবপালের রাজসভায় এক দূত প্রেরণ করেন। দেবপাল এই প্রস্তাবে সম্মতিদান করেন। আরব পর্যটক সুলেমানের বিবরণ অনুযায়ী পালরাজগণের সৈন্যসংখ্যা প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের অপেক্ষা অধিক ছিল।

দেবপালের সময়কার কতকগুলি তাম্রশাসন ও শিলালিপি এবং দানপত্র মুঙ্গের ও নালন্দায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দানপত্র ও লিপি হইতে দেবপালের রাজত্বকালের অনেক ঘটনা জানা যায়।

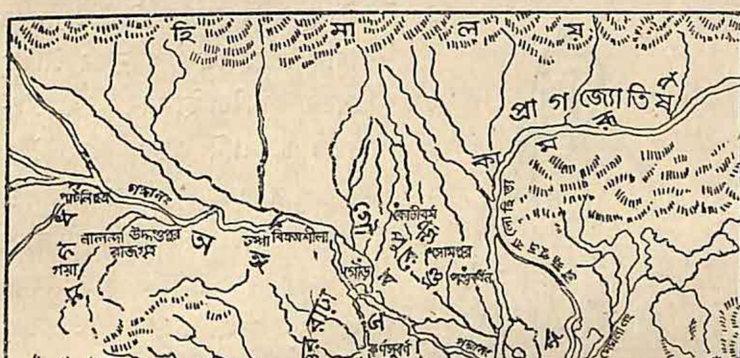
পরবর্তী পালরাজগণঃ দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পালবংশের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হয়। তাঁহার পরবর্তী পালরাজগণ দুর্বল ও সিংহাসনে আরোহণের অযোগ্য ছিলেন। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রাজনৈতিক

ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল এবং পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। পালবংশের নবম রাজা প্রথম মহীপাল পালবংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। তিনি কম্বোজগণকে বিতাড়িত করেন এবং মগধ ও পূর্ববঙ্গ জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালে চোলরাজ রাজেন্দ্রচোলের এক সেনাপতি বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। মহীপাল সম্ভবতঃ কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী রাজা নয়াপালের রাজত্বকালে কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ইহার পরই তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বর বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলার রাজগণ দুর্বল হইয়া পড়ে।

মহীপাল

কৈবর্ত বিদ্রোহ
রামপাল

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের কৈবর্তগণ দিব্যো বা দিব্যোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। দিব্যোকের পর রুদ্রক ও ভীম যথাক্রমে উত্তরবঙ্গ শাসন করিতে থাকেন। পরবর্তী পালরাজ রামপাল (১০৮৪-১১৩০ খৃঃ) সাময়িক ভাবে



প্রাচীন বাংলা

পালবংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ভীমকে পরাস্ত করিয়া তিনি উত্তর বঙ্গ পুনরধিকার করেন। ইহার পর তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম জয় করেন।

উড়িষ্যার রাজা অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গা এবং উত্তর ভারতের গহড়বালরাজ গোবিন্দ্রচন্দ্রের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ পাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার পরে সেনরাজগণ উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া লন এবং বাংলাদেশে সেনবংশের অভ্যুদয় হয়। বিহারে পাল শাসন আরও কিছুকাল বজায় ছিল। দীর্ঘ চারিশত বৎসর রাজত্বের পর পালবংশের অবসান হয়।

পালবংশের অবসান

পালবংশের কৃতিত্ব ঃ বাংলাদেশ তথা ভারতের ইতিহাসে পালবংশের রাজত্বকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। প্রায় চারিশত বৎসর পাল রাজগণ উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। আরব পর্যটক সুলেমান পালরাজগণের সামরিক প্রতিভা ও সুদক্ষ শাসনের প্রশংসা করিয়াছেন। সুমাত্রা ও যাভার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বলপুত্রদেব পাল রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পালরাজগণের শাসনকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থসমূহ পালযুগেই রচিত হইয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন এই যুগের মনীষিবৃন্দের অন্যতম। এই যুগে বিখ্যাত শিল্পী বিটপাল ও ধীমান শিল্পক্ষেত্রে এক নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপানি দত্ত ও 'রামচরিত' রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। অধিকাংশ চর্যাপদ এই যুগে রচিত। পালরাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাংলাদেশের জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক বিন্যাস তাহাতে ব্যাহত হয় নাই। নয়াপালের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কয়েকজন বৌদ্ধপণ্ডিত প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। নয়াপালের অনুরোধে সুপণ্ডিত অতীশ দীপংকর তিব্বতে গমন করেন। দীপংকর বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তিব্বতে বিপুল সম্মান অর্জন করেন।



অতীশ দীপংকর

সপ্তম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

(Society and culture in Ancient India, 4th century B. C. to 14th century A.D.)

সামাজিক অবস্থা (Social Conditions) ঃ বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্য হইতে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের সূচনায় জাতিভেদ প্রথা না থাকিলেও বর্ণ বিভাগ ছিল। কিন্তু ক্রমশ সমাজ ব্যবস্থা জটিল ও ব্যাপক হইল। গুণ, কর্ম ও বৃত্তি অনুসারে আর্যগণ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। পরবর্তীকালে বর্ণবিভাগ পুরুষানুক্রিক হইয়া পড়ে এবং বর্ণবিভাগ জাতিভেদে পরিণত হয়। সেই যুগে আর্যগণকে চারিপ্রকার নিয়মনিষ্ঠা পালন করিতে হইত। এই চারি অবস্থাকে চতুরাশ্রম নামে অভিহিত করা হয়।—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

মৌর্যযুগের সূচনায় জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একে অন্যের পেশা গ্রহণ করিতে পারিত না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির ভারতে আগমনের ফলে এবং বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করায় জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে এই যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস ভারতের অধিবাসীদের সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। যথা—দার্শনিক, সৈনিক, প্রতিবেদক, কৃষক, শিল্পী ও বণিক, অমাত্য (রাজকর্মচারী) এবং মৃগয়াজীবি ও পশুপালক। তিনি জীবিকা ও বৃত্তি অনুযায়ী জনসাধারণকে এই ভাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সমাজে নারীর স্থান ছিল খুব উচ্চে। নারীদের মধ্যে অনেকে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বুৎপত্তি ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। রাজার নারী দেহরক্ষী ছিল এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবাহিত নারী স্বামীর সহিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কার্যকলাপে যোগদান করিতে পারিত। বিধবা মহিলারা পবিত্র জীবন যাপন করিত। রাজপুরুষ ও অভিজাতগণের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল। এমনও নজীর পাওয়া যায় যে রাজ পরিবারের

মহিলারা নাবালক সন্তানদের অভিভাবিকা রূপে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু গুপ্ত যুগের অবসানের পর হইতে এবং মুসলমানদের আগমনের সময় পর্যন্ত নারীর স্বাধীনতা কমিয়া যায়। মুসলমান আক্রমণের হাত হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নানাবিধ সামাজিক নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয় এবং সমাজে রক্ষনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে নারী অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে বল্লালসেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

প্রাচীন যুগে ভারতে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, আইনের গ্রন্থ, সাহিত্য এবং অশোকের শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতীয়গণ সৎ এবং শৃংখলা পরায়ণ ছিল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত। চাষীগণ শান্ত এবং মিষ্টস্বভাবের ছিল। চুরি প্রায় ছিল না বলিলেই হয় এবং কেহ মিথ্যা কথা বলিত না। জনসাধারণ অতিথি পরায়ণ ছিল। কিন্তু দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্বেও হর্ষবর্ধনের সময় চুরি সংঘটিত হইত। ইউয়েন সাং নিজে একবার দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছাড়া জনসাধারণ মদ্যপান করিত না। মৌর্য ও গুপ্ত যুগে সমাজে যে অবস্থা ছিল হিন্দু যুগের অবসান কালে তাহার দ্রুত পরিবর্তন হইতে থাকে এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সমাজের আমূল পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে।

ধর্ম (Religion)ঃ বিদেশীদের লেখা বিবরণ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, লিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি হইতে প্রাচীন যুগের ধর্ম সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেব দেবীর পূজা সাতবাহন যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ হইতে, নানা দেব দেবীর পূজা সুরু হয়। মৌর্যোত্তর যুগে ইন্দ্র, বরুণ অগ্নির পরিবর্তে শিব, বিষ্ণু এবং কতিপয় নারী দেবতা প্রাধান্য লাভ করে। মন্দির নির্মাণও এই যুগে আরম্ভ হয়। মৌর্যযুগের সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্ম শুধু সমগ্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়। মৌর্য-যুগের অবসানের পর বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং বৌদ্ধগণ হীনযান এবং মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সম্রাট কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গ্রীকরাজ মিনান্দরও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ক মধ্য এশিয়া ও চীনে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। এই যুগ ছিল মহাযান ধর্মমতের যুগ। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ চীন সম্রাটের আমন্ত্রণেঃচীনে গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থাদি চৈনিক ভাষায় অনূদিত করেন। মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের

ফলে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। যে সকল বৈদেশিক জাতি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করে তাহারা ক্রমে হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া যায়।

শুঙ্গবংশ এবং কান্ব বংশের সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গুপ্ত সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। গুপ্ত যুগে হিন্দুধর্মে ভক্তির আধিক্য লক্ষণীয়, তাহার ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। জীবে প্রেম ও দয়া এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল এই যুগের ধর্মের মূল কথা। ইহাই হইল ভক্তিবাদ। বৈষ্ণব ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম। গুপ্ত রাজগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক বা বৈষ্ণব। বৈদিক যাগযজ্ঞ অপেক্ষা ভক্তিমূলক পূজা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। পূজায় ভক্তি হইল প্রধান, ভক্তি থাকিলে পূজা সার্থক। বিষ্ণু ছাড়া শিব, সূর্য ও কার্তিকের উপাসনাও প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব কমিয়া যায়।

গুপ্তোত্তর যুগে হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা হইলেও বৌদ্ধধর্ম আর পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পায় নাই। হিন্দু যুগের শেষদিকে মুসলমানদের ভারতে আগমনের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধিনিষেধ আরোপিত হয়। বাংলায় রঘুনন্দন শিরোমণি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃপদে আসীন হন। ফলে হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার মিলনের পথে দুর্লংঘ বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকিবার ফলে উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহনশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা সুরু হয়। ভক্তিবাদ প্রচারকদের মধ্যে রামানুজ, রামানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব, নমদেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞান (Art, Literature and Science): হিন্দু যুগে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ভারতের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুইটি প্রাচীন ভারতের অভূতপূর্ব সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন। মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয় তাহার মধ্যে পতঞ্জলির মহাভাষ্য, পানিনির অষ্টধ্যায়ী উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন অশ্বঘোষ, কুমারিলভট্ট'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম অব্দে বৌদ্ধ পালি সাহিত্য রচিত হয়। গ্রীকরাজ মিনান্দারের নামে রচিত মিলিন্দপনহো গ্রন্থ এই সময়কালেই রচিত হয়।

গুপ্তযুগকেই হিন্দু যুগের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই যুগে ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। সমুদ্রগুপ্ত নিজেই ছিলেন সু-সাহিত্যিক। তিনি কবিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি কবি এবং সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার সভায় যে সব জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিদের সবাবেশ হইয়াছিল তাহার মধ্যে হরিষেনের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিষেন রচিত সমূদ্রগুপ্তের প্রশস্তি এলাহাবাদ স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ করা হয়। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় পিতার পদাংক অনুসরণ করেন। তাঁহার রাজদরবারে নয়জন বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কালিদাস। কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, মালবিকাগ্নিমিত্রম বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শূদ্রকের নাটক মৃচ্ছকটিক, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস এইযুগে রচিত দুইখানি অপূর্ব সাহিত্য গ্রন্থ। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু এই যুগের খ্যাতনামা মনিষীদের অন্যতম। গুপ্তোত্তর যুগে ভবভূতি এবং বাকপতিরাজা কনৌজের রাজা যশোবর্মনের আনুকূল্যলাভ করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর শেষদিকে বিখ্যাত মনিষী রাজশেখর কনৌজের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

গুপ্তোত্তর যুগে সাহিত্যের তেমন উৎকর্ষতা না থাকিলেও সাহিত্যচর্চ্চার ধারা অব্যাহত ছিল। এই যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে পাওয়া যায়, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, ক্ষেমীশ্বর এবং কৃষ্ণমিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ গীত গোবিন্দ রচনা করেন। অন্যান্য মনিষীদের মধ্যে দণ্ডিন, শান্তিদেব, কামনদক, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গুপ্তোত্তর যুগে সাহিত্যের উৎকর্ষতা তেমন না থাকিলেও, এই যুগেরই ঐতিহাসিক সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ের রচিত ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে বানভট্ট রচিত হর্ষ চরিত, সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত, বিলহন রচিত 'বিক্রমাংক দেবচরিত এবং কল্হন রচিত রাজতরঙ্গিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাদব বংশের শাসন কালে বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী ভাস্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই যুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহ মিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। আর্যভট্ট এবং বরাহমিহির গ্রীক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের রচনায় গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট।

মুসলমান যুগের সূচনায় এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ফার্সী ভাষায় ইতিহাস ও সাহিত্য রচিত হইলেও, মুসলমানগণ সংস্কৃতকে একেবারে অবজ্ঞা করে নাই। মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপিত হইলেও হিন্দুগণের সাহিত্য প্রতিভা নষ্ট হইয়া যায় নাই। মুসলমান পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। ফিরোজ তুঘলক ও সিকন্দর লোদীর সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। সুলতানী যুগের সংস্কৃত সাহিত্যিকদের মধ্যে পার্থসারথী মিশ্র, জীব গোস্বামী, জয়সিংহ সুরী, বাচস্পতি মিশ্র, পদ্মনাভ দত্ত এবং মাধব বিদ্যারণ্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফার্সীভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি আমীর খসরু বলবন, আলাউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিরাছিলেন। এই যুগে ফার্সী ভাষায় অনেক ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। এই যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বৈষ্ণব লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে কবি চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলার লোক হইলেও বাংলার কবি। বিদ্যাপতি রাজা শিব সিংহের সভাকবি ছিলেন। মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসও এক মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন সাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ভাগবত বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত যুগে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগের বহু শিল্প নিদর্শন পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। মৌর্য যুগের আবিষ্কৃত শিল্প নিদর্শনগুলির অধিকাংশই অশোকের সময়ে নির্মিত। অশোকের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে পাটলীপুত্রে তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ফা-হিয়েন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অশোক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মঠ, স্তম্ভ, চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতি নির্মাণ করান। বরাবর পর্বতে নির্মিত চৈত্য ও ইহার মসৃণ স্তম্ভ, সারনাথের স্তম্ভশীর্ষ ও সাঁচীতে আবিষ্কৃত স্তূপ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সম্রাট অশোকের সময় একটি মাত্র প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত স্তম্ভগুলি মৌর্যযুগের উন্নত শিল্প প্রতিভার নিদর্শন। সারনাথের সিংহচূড়া ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অনেকের মতে মৌর্যশিল্পে গ্রীক ও পারসিক প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু গ্রীক ও পারসিক প্রভাব ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিতে পারে নাই। বৈদেশিক শিল্পের প্রভাবে ভারতীয় শিল্পে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

শিল্প

অনেকে আবার মৌর্য শিল্পে গ্রীক ও পারসিক শিল্পের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন না।

গুপ্তযুগের অধিকাংশ শিল্প নিদর্শন মুসলমান আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে কয়টি নিদর্শন এখনও রহিয়াছে তাহা গুপ্তযুগের ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব উন্নতির স্বাক্ষর প্রদান করিতেছে। স্থাপত্য শিল্পের চরম বিকাশ হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সময় নির্মিত বহু সুন্দর সুন্দর, বুদ্ধ, শিব ও বিষ্ণুমূর্তি, সারনাথ, মথুরা এবং বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহার সূক্ষ্ম শিল্পকার্য ঐতিহাসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া ও প্রস্তর খনন করিয়া যে সকল গুহা নির্মিত হইত সেই সব গুহার দেওয়ালে বিভিন্ন চিত্র অংকন করা হইত। অজন্তার গুহাগাত্রে যে সকল চিত্র অংকিত দেখা যায় তাহা অধিকাংশই গুপ্তযুগের সৃষ্টি। অজন্তার গুহাগাত্রে অংকিত মূর্তি ও দৃশ্যাবলী রহিয়াছে অনেকের মতে এই চিত্রগুলি রেনেসাঁসের যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির সমতুল্য। এই যুগে ধাতুশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। দিল্লীর নিকট চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ, বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ ও তাম্রমূর্তিগুলি ধাতুশিল্পের নিদর্শন।


অজন্তার গুহাগাত্রে অংকিত মা ও ছেলে

এই যুগে দক্ষিণ ভারতেও শিল্প এবং সাহিত্যের অপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। চালুক্য, পল্লব ও রাষ্ট্রকূটগণের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতের শিল্প অপূর্ব উৎকর্ষতা অর্জন করিয়াছিল। অজন্তার গুহা চিত্রের অনেকগুলি চিত্র চালুক্যদের রাজত্বকালেই অংকিত হইয়াছিল এবং বাতাপি ও 'পাট্টাদাকল'এ বৃহৎ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পল্লব রাজগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পল্লব যুগের শিল্প ও সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মহেন্দ্রবর্মণের সময় পাথর কাটিয়া মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি আরম্ভ হয়। নরসিংহবর্মণ মামল্লা-

পুরম বা মহাবলীপুরম নগরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে প্যাগোডা বা রথ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। মহাবলী পুরমের মন্দির ও মূর্তিগুলি অপূর্ব নিদর্শন। কাঞ্চীর ঐরাবতেশ্বরের মন্দিরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর্কট, চিংলেপুট ও ত্রিচিনাপল্লী জেলায় এবং কাঞ্চীতে পল্লবরাজগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দিরগুলি দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের গৌরব। চোলদের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত পল্লব শিল্পরীতি অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাষ্ট্রকূট যুগেও পল্লব শিল্পরীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটগণ সমগ্র রাজ্যে বহু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বকালে নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। একখানি বিরাট পাথরকে খোদাই করিয়া মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। এই মন্দিরের মুখ্য দেবতা শিব। এই মন্দিরের সজীবতা ও সৌন্দর্য বিস্ময়কর। চোলরাজ প্রথম রাজা বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট ও চোলরাজগণ সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কল্যাণীর চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন বিল্হন। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিক্রমাংকদেব চরিত' রচনা করেন। পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ভারবি ও দণ্ডিন ছিলেন এই যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ নিজে ছিলেন সুসাহিত্যিক। পল্লবদের সময় দক্ষিণভারতে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল এবং কাঞ্চী ছিল ইহার প্রধান কেন্দ্র। রাষ্ট্রকূট রাজগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম অমোঘবর্ষ নিজে ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। তিনি 'রত্নমালিকা' ও 'কবিরাজমার্গ' গ্রন্থ দুইটি রচনা করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন।

দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ঃ দক্ষিণ ভারতে আর্য ধর্ম ও সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধধর্মও দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে শৈব ও বৈষ্ণবগণ জৈন ও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু করেন। ফলে বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব কমিয়া আসিতে থাকে এবং হিন্দুধর্ম শক্তিশালী হইয়া উঠে। দক্ষিণ ভারতের শৈব প্রচারকদের মধ্যে তেষট্টিজন বিখ্যাত। ইহারা 'নাইনার' নামে পরিচিত। শৈব নাইনারদের মধ্যে সুন্দরমূর্ত্তি, অপ্পর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব সাধুগণকে 'আলবার বলা হইত। বৈষ্ণব আলবারদের মধ্যে কুশশেখর,

নম্ম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কুমরিলভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকগণ খ্যতিলাভ করিয়াছিলেন। শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ প্রাচীনকালে জনসাধারণ সৎ ও সাধারণ জীবন যাপন করিত। কৃষি, পশুপালন, শিকার এবং ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মৌর্য সম্রাটগণ সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। শিল্পকার্য উন্নতিলাভ করিয়াছিল, দেশে খাদ্যাভাব ছিল না। দুর্ভিক্ষ খুব কমই হইত। গুপ্তযুগেও জনসাধারণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিত, কৃষি ছিল জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। তাম্রলিপ্ত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এখান হইতে ভারতীয় বণিকগণ সিংহল ও পূর্বভারত দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে যাইত। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ঠ উন্নতি হইয়াছিল। চীন ও রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের. বাণিজ্য চলিত। কুষাণ যুগে রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। মধ্য এশিয়ায় কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে চীন, ভারত ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে স্থলপথে বাণিজ্যের পথ স্থাপিত হইয়াছিল। মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, মণিমুক্তা, হাতীর দাঁত, মূল্যবান পাথর, রেশম, মসলিন কাপড় প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী ভারতীয় বণিকগণ রোমের বাজারে রপ্তানি করিত। মিশর হইতে বণিকগণ জলপথে দক্ষিণ ভারতের বন্দরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ভারতীয় বণিকগণও সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। রোমের বাজারে ভারতীয় পণ্যের বিশেষ চাহিদা ছিল। এই সকল জিনিস রপ্তানি করিয়া ভারতীয় বণিকগণ রোমের মুদ্রা ও স্বর্ণ ভারতে লইয়া আসিতেন। মিশর হইতে ভারতের পণ্য ইউরোপের বাজারে যাইত। গ্রীক ও রোমকগণ আলেকজান্দ্রিয়া ও মেসোপটেমিয়া হইয়া ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে আসিত। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে ভারতীয় বণিকগণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করিতে যাইত। এমন কি দশম ও একাদশ শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতের বণিকগণ এই সকল অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য করিতেন।

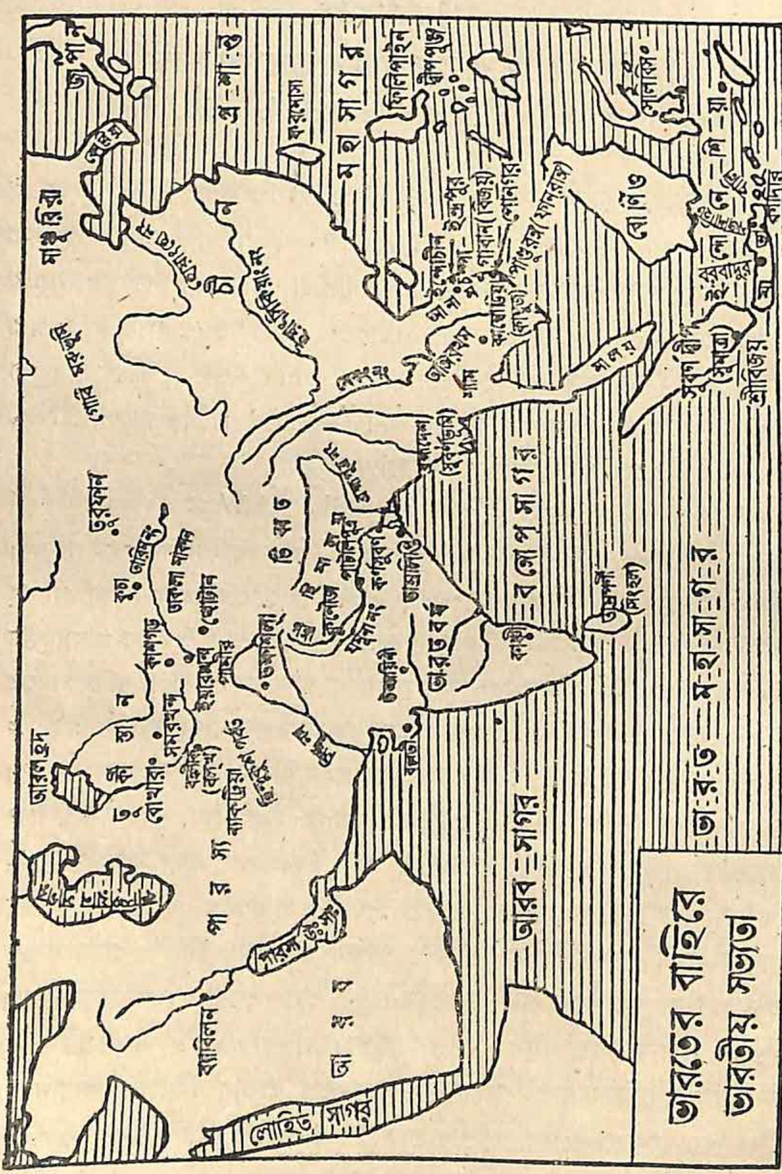
অষ্টম অধ্যায়

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি
(Indian culture and civilization beyond India)

ভারতের চারিদিকে সমুদ্র ও পর্বতবেষ্টিত হইলেও সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতি সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের নব্য প্রস্তর যুগের অধিবাসীরা সম্ভবতঃ জলপথে ও স্থলপথে ইন্দোচীনে গমন করিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের মতে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতার সহিত পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ ছিল। অনেকের মতে দ্রাবিড়গণ বাহির হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। সুপ্রাচীন কালেও মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও মিশরের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল।

ভারত ও পশ্চিম এশিয়া (India and West Asia): চতুর্থ খৃঃ পূঃ ভারতের সহিত পশ্চিম এশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার ও সেলুকাসের ভারত আক্রমণের ফলে উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে অশোকের ধর্মপ্রচারের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকগণের ভারতে রাজ্যস্থাপন করিবার ফলে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কুষাণ যুগে ভারতে রোমের প্রভাব পড়িয়াছিল এবং ২৬ খৃঃ পূঃ একজন পাণ্ড্যরাজা রোম সম্রাট অগস্টাসের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে লিখিত "পেরিপ্লাস অব-দি-এরিত্রিয়ান সী" নামক গ্রন্থে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে। প্লিনীর বিবরণীতে ভারতের সহিত রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া ভারতীয় বণিকগণ রোম হইতে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করিত। ভারতের সহিত রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর। ভারতের দর্শন, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীক শিল্প, স্থাপত্য ও জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছিল। সিন্ধুদেশে আরবদের আগমনের সময় হইতে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যিক আদান প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ভারত ও মধ্য এশিয়া (India and Central Asia): স্যার অরেল স্টাইনের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও



সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খোটানে এবং অন্যান্য স্থানে বালুকা-রাশির নীচে বহু হিন্দু দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্তি এবং পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

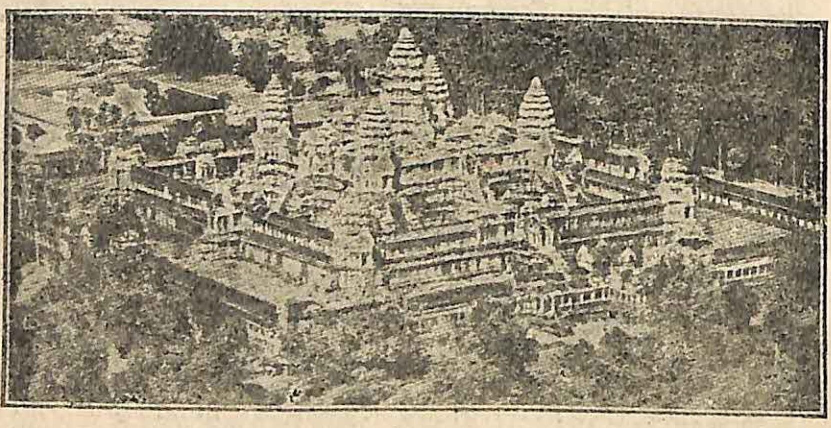
খোটানে ও মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। কুষাণ রাজগণের প্রচেষ্টায় মধ্য এশিয়ায় তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ মধ্য এশিয়া ও চীনে গমন করেন। কুচা, তুরফান, বজকলিক-প্রভৃতি স্থান ভারতীয় বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। মধ্য এশিয়া হইতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

ভারত ও তিব্বত (India and Tibet) ঃ সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ গামপো'র রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। খোটানে যে সকল ভারতীয় অক্ষর প্রচলিত হইয়াছিল, তিনি তাহা তিব্বতে প্রচলন করেন। বাংলার পালরাজগণের সহিত তিব্বতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপংকর তিব্বতের রাজার অনুরোধে তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নালন্দা ও বিক্রমশীলায় শিক্ষালাভ করিবার জন্য আসিতেন। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থসমূহ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

ভারত ও ব্রহ্ম (India and Burma) ঃ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ব্রহ্মে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। আরাকানে কয়েকটি ভারতীয় রাজবংশ রাজত্ব করিত। একাদশ শতাব্দীতে মধ্যব্রহ্মের প্যাগান রাজ্যের রাজা অনিরুদ্ধ ও তাঁহার পুত্র কয়ানজিথা ভারতের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যোগাযোগের ফলে ব্রহ্মের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (India and South-East Asia) ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই মালয়, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, শ্যাম প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাম্রলিপ্ত, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি বন্দর হইতে ভারতীয় বণিকগণ এই সকল দেশে যাতায়াত করিত। কালক্রমে এই সকল দেশে ভারতীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহার ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। শ্যামে বহু হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মালয়ে অনেকগুলি ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। কয়েকটি সংস্কৃত লিপিও এখানে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয়

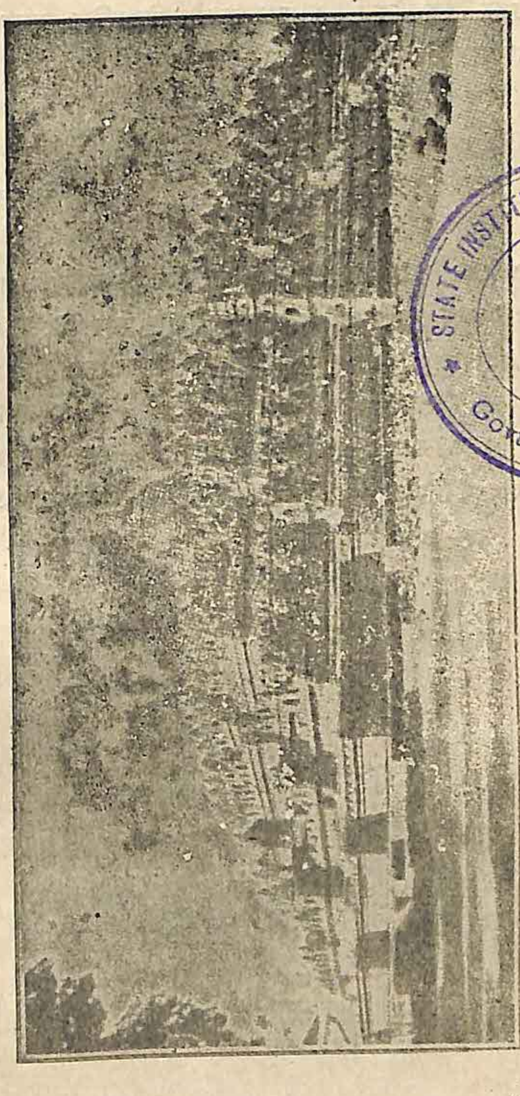
প্রথম শতকে কাম্বোডিয়ায় ফুনান নামে একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফুনানের পর কম্বোজে আর একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। জয়বর্মন, ভববর্মন, সূর্যবর্মন প্রভৃতি রাজাদের অধীনে কম্বোজ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। বহু-সংখ্যক সংস্কৃত লিপি হইতে এই রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় জানা যায়। কম্বোজে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল। শিবপূজার অধিক প্রচলন ছিল। আংকোর-ভাটের বিষ্ণুমন্দির ও বেয়নের শিবমন্দির কম্বোজের ভাস্কর্য শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে থাই ও আনাম জাতির আক্রমণে এই রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইন্দোচীনের অন্তর্গত চম্পায় আর একটি হিন্দু রাজ্য দ্বিতীয়



আংকোরভাটের বিষ্ণু মন্দির

শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। চম্পার রাজগণ কম্বোজ রাজের আক্রমণ ও মোঙ্গলনেতা কুবলাই খানের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীমার এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই রাজ্যের বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে শম্ভুবর্মণ, ইন্দ্রবর্মণ, হরিবর্মণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল। চম্পা হিন্দু সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় নামে একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম প্রধানকেন্দ্র ছিল শ্রীবিজয়। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশের নেতৃত্বে সুমাত্রা, যাভা, মালয়, বোর্নিও প্রভৃতি দেশ লইয়া শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শৈলেন্দ্র-রাজগণ খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহারা মহারাজা উপাধি ধারণ করিতেন। আরব বণিকদের বিবরণীতে ইহাদের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজগণ ভারত ও

চীনের সহিত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজগণের বিশাল নৌবাহিনী ছিল। বাংলার পালরাজা দেবপালের



বরবুদুরের বৌদ্ধ মন্দির

সহিত শৈলেন্দ্ররাজ বলপুত্রদেবের দূত বিনিময় হইয়াছিল। শৈলেন্দ্ররাজবংশের সময় বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। নবম শতাব্দী হইতে

এই বংশের পতন আরম্ভ হয় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। যাভা ও বলিদ্বীপেও হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। যাভার নৃত্যগীত ও পোষাক পরিচ্ছদে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। এই দুইটি রাজ্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। আংকোরভাটের বিষ্ণুমন্দির, আংকোরথামের শিবমন্দির, বরবদুরের বৌদ্ধমন্দির ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। বহু বৌদ্ধমূর্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, সংস্কৃত লিপি ও পুঁথি এই সকল দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের ফলে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের ফলে এক 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া ওঠে।

সিংহল ও চীন

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীন ও সিংহলে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। এই দুইটি দেশের সহিত ভারতের প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই দুই দেশে প্রসারলাভ করে। অশোকের সময় মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্য গমন করেন এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম সিংহলে প্রচারিত হয়। চীনের সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। বহু চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছেন। ভারতের সহিত চীনের দীর্ঘদিনের অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রহিয়াছে।

নবম অধ্যায়

সুলতানি ও মুঘল শক্তির অভ্যুদয় ও পতন

(Rise and fall of Sultanate and Mughal Power)

সিন্ধু বিজয় (Conquest of Sind) : অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় আরবদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি চরম সীমায় উপনীত হয়। ৭০৮ খৃঃ সিংহলের রাজা একটি জাহাজে করিয়া মূল্যবান উপঢৌকন এবং সিংহলে জাত কয়েকজন অনাথা মুসলমান স্ত্রীলোককে খলিফার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুর নিকটবর্তী সামুদ্রিক বন্দর দেবলের কাছে জলদস্যুগণ কর্তৃক এই জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। ইরাকের মুসলিম শাসনকর্তা হজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট ইহার ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু সিন্ধুরাজ দাহির এই ক্ষতিপূরণ দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ফলে হজ্জাজ খলিফার অনুমতি লইয়া সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু হজ্জাজ ইহাতে হতাশ না হইয়া তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বিন কাশেমের নেতৃত্বে আর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। কাশিম ৭১২ খৃষ্টাব্দে দেবল অধিকার করেন। অতঃপর রাওয়ার দুর্গের অনতিদূরে উভয় পক্ষে যে তুমুল যুদ্ধ হয় তাহাতে দাহির পরাজিত ও নিহত হন। কাশিম দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। কাশিম ইহার পর ব্রাহ্মণবাদ, আলোর ও মূলতান অধিকার করিলেন। ইহার পর কাশিম কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী কনৌজের দিকে প্রেরিত হইল। কিন্তু কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ও গুর্জরগণ আরব অগ্রগতি প্রতিরোধ করেন। কাশিমের কৃতিত্বপূর্ণ জীবন অকস্মাৎ শেষ হইয়া যায়। ক্রুদ্ধ খলিফার নির্দেশে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কাশিমের ভারত অভিযান

রাওয়ারের যুদ্ধ

বিভিন্ন স্থান অধিকার

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল (Result of Arab Conquest of Sind) : আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতের ইতিহাসের একটি ঘটনা মাত্র। "...an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results". সিন্ধুকে কেন্দ্র করিয়া আরবগণ ভারতের অন্যান্য অংশ জয় করিতে পারে নাই। ভারতের বিভিন্ন দিকে অভিযান প্রেরণ

করিলেও গুর্জরপ্রতিহারগণের নিকট তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আরব অধিকৃত সিন্ধু ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সিন্ধুর জনসাধারণের একাংশকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিলেও এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা, ভাষা, আচারব্যবহার, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বরং আরবগণই ভারতের সঙ্গীত, চিত্রকলা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। আরবগণ ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ (Indian expeditions of Sultan Mahmud)ঃ আলপ্তিগিণ নামক একজন তুর্কী ক্রীতদাস গজনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৬৩ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে ৯৭৭ খৃঃ তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগিণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় লামঘান হইতে কাংরা পর্যন্ত বিস্তৃত হিন্দুশাহী রাজ্যের রাজা ছিলেন জয়পাল। তিনি বারবার সবুক্তিগিণের হস্তে পরাজিত হন।

সবুক্তিগিণের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র ইসমাইলকে পরাজিত করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র মামুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর প্রায় প্রতি বৎসরই ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। ইহার মধ্যে সতেরোটি অভিযান ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১০০১ খৃঃ তিনি জয়পালকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। জয়পাল প্রচুর অর্থ ও পঞ্চাশটি হস্তী প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার পুত্র আনন্দপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি বারংবার মামুদের হস্তে পরাজিত হন। সিন্ধুনদ হইতে নগরকোট পর্যন্ত ভূখণ্ড মামুদের অধিকৃত হয়। আনন্দপালের পর তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। কিন্তু তিনিও ক্রমাগত মামুদের হস্তে পরাজিত হন। ১০২৬ খৃঃ তাঁহার পুত্র ভীমপালের মৃত্যু হইলে শাহী বংশের অবসান হয়। মামুদ ১০০৬ খৃঃ ও ১০০৮ খৃঃ মূলতান এবং ১০০০ খৃঃ ভাটিণ্ডা দুর্গ অধিকার করেন। ১০০৯ খৃঃ তিনি নারায়ণপুর অধিকার করেন এবং ১০১৪ খৃঃ থানেশ্বর আক্রমণ করিয়া চক্রস্বামীর মন্দির লুণ্ঠন করেন। ইহার পর মামুদ মথুরা ও কনৌজ অধিকার করেন। মথুরার প্রতিটি মন্দির লুণ্ঠন করা হয়। ১০২২ খৃঃ তিনি কালিঞ্জর অবরোধ করেন। চন্দেল্লরাজ বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। ১০২৫ খৃঃ মামুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি হস্তগত করেন।

অসাধারণ সামরিক প্রতিভার বলে সুলতান মামুদ ভারত ও ভারতের বাহিরে মধ্য এশিয়ায় এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ভারতের জনগণের নিকট নিষ্ঠুর ও লোভী রক্ত পিপাসু যোদ্ধারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ফিরদৌসী, অল-বিরুণী, আনসারী ফারুকী প্রভৃতি মুসলমান পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। মামুদ নিজেও একজন কবি ছিলেন। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। ভারতের মন্দির, দুর্গ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া যে সম্পদ তিনি অপহরণ করেন তাহার দ্বারা বহু অট্টালিকা, মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া গজনীকে সুশোভিত করেন। ভারতের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিলেও এবং অসংখ্য মানুষকে হত্যা করিলেও তিনি ভারতের কোন অঞ্চল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। কেবলমাত্র গজনীর নিরাপত্তার জন্য তিনি হিন্দুশাহী রাজ্য নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বারংবার ভারত অভিযানের ফলে পরবর্তীকালে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়াছিল। কারণ তাঁহার আক্রমণের ফলে ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং ঘুরীর ভারত অভিযান সহজ হইয়াছিল।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণ (Invasion of Muhammad Ghor)ঃ ১০০৯ খৃঃ গজনীর সুলতান মামুদ হিরাট ও গজনীর মধ্যবর্তী ঘুর রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় তাহার সুযোগ লইয়া ঘুর রাজ্যের শাসক গিয়াসউদ্দিন গজনী অধিকার করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইজউদ্দিনকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুইজউদ্দিন বা শিহাবউদ্দিন ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত।

১১৭৫ খৃঃ ঘুরী প্রথম ভারত অভিযান করেন। তিনি মূলতান ও উচ্ দুর্গ জয় করেন। ১১৭৮ খৃঃ তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হন। পরবৎসর তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন এবং শিয়ালকোটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহার পর তিনি লাহোরে গজনীর শাসক খসরু মালিককে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। এই সময় উত্তর ভারতে একাধিক হিন্দুরাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দিল্লী ও আজমীরের রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান, বিহারে পাল-রাজবংশ, বাংলায় সেন রাজবংশ, বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্লবংশ এবং কনৌজের গহড়-বাল বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন

বিভিন্ন অভিযান

কনৌজ ও বারাণসীর গহড়বাল রাজ জয়চন্দ্র। তিনি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানের শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এইজন্য মহম্মদ ঘুরী যখন পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন তখন জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করেন নাই। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মহম্মদ ঘুরীকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল।

তরাইনের যুদ্ধ

১১৯০-৯১ খৃঃ ঘুরী বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও আহত হন। কিন্তু পরবৎসরই তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বন্দী করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল। ইহার পরই ঘুরী হানসী, সামানা, কুরম এবং আজমীর অধিকার করেন। আজমীরের শাসনভার পৃথ্বীরাজের এক পুত্রের হস্তে অর্পণ করা হয়। দিল্লী রাজপুতদের হস্তে রহিল। ভারতে অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার কুতুবউদ্দিন আইবক নামক একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কুতুবউদ্দিন ১১৯২ খৃঃ চরণ ও মীরাট অধিকার করেন। ইহার পরই তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া দিল্লীতে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন।

কুতুবউদ্দিনের অভিযান

১১৯৪ খৃঃ কুতুবউদ্দিন আলীগড় অধিকার করেন। পর বৎসর ঘুরী পুনরায় ভারতে আসেন এবং চান্দাওয়ার যুদ্ধে জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহার পর কুতুবউদ্দিন হান্‌সী বারাণসী ও কনৌজ অধিকার করেন। ১১৯৫-৯৬ খৃঃ ঘুরী পুনরায় ভারতে আসেন এবং বেয়ানা অধিকার করেন। ইহার পর কুতুবউদ্দিন গুজরাট, কালিঞ্জর ও মাহোবা অধিকার করেন। চন্দেল্লরাজ পরমার্দি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।

বক্তিয়ার খল্‌জী ; উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ বিজয়

এই সময় ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খল্‌জী পূর্বভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। মীর্জাপুর জেলায় তাঁহার ক্ষুদ্র জায়গীর ছিল। তুর্কী বণিকের ছদ্মবেশে তিনি নদীয়া বা নবদ্বীপে প্রবেশ করেন। এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া সেনরাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। ইহার পর বক্তিয়ার খল্‌জী গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হন এবং উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদা এবং দিনাজপুর জেলার উপর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তিনি তিব্বত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার

তিব্বত অভিযান ব্যর্থ হয়। ১২০৬ খৃঃ আলীমর্দান খল্‌জি নামক একজন সৈনিকের হস্তে তিনি নিহত হন।

১২০৫ খৃঃ মহম্মদ ঘুরী তুর্কমানদের হস্তে পরাজিত হন। ইহার ফলে খোকার উপজাতিগণ ও লবণ পর্বত অঞ্চলের উপজাতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে এক আততায়ীর হস্তে ঘুরী নিহত হন।

মহম্মদ ঘুরী একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের শাসকরূপে জীবন সুরু করিয়া তিনি আফগানিস্থান হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শুধু একজন আক্রমণকারী নহেন—এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার কৃতিত্বের ফলে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

ঘুরীর কৃতিত্ব

দিল্লীতে সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা

দাসবংশ (Slave Dynasty) ঃ মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার প্রিয় ক্রীতদাসগণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এই সময় তাঁহার বংশের বামিয়ান শাখার জনৈক আলাউদ্দিন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঘুর রাজ্যের অধিপতি হন। কিন্তু ঘুরীর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের পুত্র মামুদ তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু ইহার পর তাজউদ্দিন ইলদাজ গজনী অধিকার করেন। ভারতে ঘুরীর অধিকৃত অঞ্চলসমূহ কুতুবউদ্দিনের হস্তগত হয়। তিনি ১২০৬ খৃঃ ২৪শে জুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ দাসবংশ নামে পরিচিত। ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

কুতুবউদ্দিন আইবক ১২০৬-১০ খৃঃ (Qutubuddin Aibak) ঃ কুতুবউদ্দিন আইবক জাতিতে ছিলেন তুর্কী। ক্রীতদাস হিসাবে তিনি জীবন সুরু করেন। প্রথমে নিশাপুরের কাজী তাঁহাকে ক্রয় করেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কুতুবউদ্দিনকে ঘুরীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। নিজ প্রতিভাবলে তিনি শীঘ্রই ঘুরীর অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। অল্পকালের মধ্যে তিনি দিল্লী, গোয়ালিয়র, ঝান্‌সী, কনৌজ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ভারতে মুসলমান, সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। তাঁহার সময়েই বক্তিয়ার খল্‌জী বিহার ও বাংলাদেশ জয় করেন।

মহম্মদ ঘুরীর আরও দুইজন শক্তিশালী ক্রীতদাস ছিলেন। ইহারা হইলেন মুলতান এবং উচ্'এর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং কিরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইলদাজ। ঘুরীর মৃত্যুর পর তাজউদ্দিন গজনী অধিকার করেন। কিন্তু কুতুবউদ্দিন গজনী অধিকার করিয়া সাময়িকভাবে তাজউদ্দিনকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাজউদ্দিন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। কুতুবউদ্দিন কেবলমাত্র ভারতের সুলতান রহিলেন। ১২১০ খৃঃ চৌগান বা পোলো খেলিবার সময় অশ্ব হইতে পতনের ফলে লাহোরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুতুবউদ্দিন প্রায় চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া ভারতে স্বাধীন সুলতানি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিপুণ যোদ্ধা, দানশীল, ধর্মপ্রাণ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য তিনি "লাখবকস্" নামে পরিচিত ছিলেন। দিল্লী ও আজমীরে তিনি দুইটি মসজিদ নির্মাণ করান। মুসলমান লেখকগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কৃতিত্ব

ইলতুৎমিস (Iltutmish) : কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র আরাম বকস্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন। দিল্লীর আমির ওমরাহগণ বদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক শামসুদ্দিন ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার আমন্ত্রণ জানাইলেন। ইলতুৎমিস্ কুতুবউদ্দিনের জামাতা ছিলেন। তিনি যুদ্'এর প্রান্তরে আরামকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইলতুৎমিস্ ইলবারী গোষ্ঠিভুক্ত তুর্কী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতাগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে এক বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। অতঃপর কুতুবউদ্দিন তাঁহাকে ক্রয় করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। তিনি গোয়ালিয়র বরণ ও বদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সামরিক প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে "আমির-উল-উমারা" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সিংহাসনে আরোহণ কালে ইলতুৎমিস বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমেই ইলতুৎমিস দিল্লী, বদায়ুন, অযোধ্যা, বেনারস এবং শিবালিক পর্বতমালা অঞ্চলে, স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। দিল্লীর নিকট যুদ'এর প্রান্তরে তিনি বিদ্রোহী আমীর ওমরাহদের পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করেন। ১২১৬ খৃঃ তিনি তরাইনের যুদ্ধে তাজউদ্দিন ইলদাজকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১২২৮ খৃঃ

তাজউদ্দিনের পরাজয়

নাসিরউদ্দিন সম্পূর্ণভাবে ইলতুৎমিসের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে সিন্ধুপ্রদেশ ইলতুৎমিসের অধিকারভুক্ত হয়। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা তাঁহাকে সুলতানরূপে স্বীকৃতি দেন এবং বহুমূল্য রাজকীয় পোশাক ও পত্র পাঠান। ১২২১ খৃঃ খারিজমের শেষ শাহ জালালউদ্দিন মঙ্গবাণীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চেঙ্গিস খাঁ ভারতে প্রবেশ করেন। মোঙ্গল আক্রমণ এড়াইবার উদ্দেশ্যে ইলতুৎমিস জালালউদ্দিনকে আশ্রয় প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। জালালউদ্দিন সিন্ধু ও উত্তর গুজরাট লুণ্ঠন করিয়া পারস্যে চলিয়া গেলে মোঙ্গলগণও ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করে। ইহার পর ইলতুৎমিস বাংলাদেশ জয় করেন। ১২২৫ খৃঃ ইলতুৎমিস সসৈন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দিন সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু সুলতানের প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সুলতানের পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। নাসিরউদ্দিন বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইখতিয়ারউদ্দিন বাল্‌খা বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু ইলতুৎমিস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া আলাউদ্দিন জানীকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২২৬ খৃঃ হইতে ১২৩২ খৃঃ মধ্যে ইলতুৎমিস রণথম্ভোর, মান্দাওয়ার ও গোয়ালিয়র অধিকার করেন। ১২৩৪ খৃঃ তিনি ভিলসা ও উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করেন। ১২৩৬ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

খলিফার স্বীকৃতি

বাংলাদেশ জয়

দাসবংশীয় সুলতানগণের মধ্যে ইলতুৎমিসই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ ও বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় তিনি পান নাই। তিনি ধর্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য তিনি সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

সুলতানা রিজিয়া ১২৩৬-৪০ খৃঃ (Sultana Raziyya): ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা রিজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কারণ সুলতানের জীবিতকালে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছিল। অন্যান্য পুত্রেরা অপদার্থ ও অযোগ্য ছিলেন। এইজন্য ইলতুৎমিস জীবিত-কালেই রিজিয়াকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। তথাপি একদল আমীর ওমরাহ ইলতুৎমিসের মধ্যমপুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ও দিল্লীর প্রভাবশালী নাগরিকগণ রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রিজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ

সমর্থন করেন। রিজিয়া ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন নারী। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানগণ এবং বিশেষতঃ আমীর ওমরাহগণ নারীর শাসন বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া রিজিয়া পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। গোঁড়া মুসলমানগণ ইহা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করিতেন। রিজিয়া জালালউদ্দিন ইয়াকত নামক একজন হাবসী অনুচরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। ইহাতে তুর্কী আমীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১২৪০ খৃঃ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কবির খাঁ বিদ্রোহ হন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। ইহার পর সিরহিন্দের শাসনকর্তা ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহার হস্তে ইয়াকত নিহত হন এবং রিজিয়া বন্দী হন। ইতিমধ্যে আমীর ওমরাহগণ রিজিয়ার ভ্রাতা মুইহউদ্দিন বাহরামকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। রিজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করিয়া সসৈন্যে বাহরামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু ১২৪০ খৃঃ রিজিয়া ও আলতুনিয়া বাহরামের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

অভিজাতগণের বিরোধিতা

পতন

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ রিজিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। মুসলমান যুগে তিনি একমাত্র মহিলা, যিনি দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক সেনাপতি, সুদক্ষ যোদ্ধা, বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক।

কৃতিত্ব

নাসিরউদ্দিন মামুদ ১২৪৬—৫৬ খৃঃ (Nasiruddin Mahamud) ঃ রিজিয়ার পতনের পর মুইজউদ্দিন বাহরাম ও আলাউদ্দিন মামুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন। মোঙ্গলগণ এই সময় ভারত আক্রমণ করে ও সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেয়। আমীর ওমরাহগণ তখন ইলতুৎমিসের অন্যতম পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। কিন্তু তিনি অযোগ্য ও দুর্বল চরিত্রের সুলতান ছিলেন। রাজ্যের শাসনভার তিনি মন্ত্রী উলুঘ খাঁর (গিয়াসউদ্দিন বলবন) হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ১২৬৬ খৃঃ নাসিরউদ্দিনের মৃত্যু হইলে আমীর ওমরাহগণের সমর্থনে বলবন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৬-৮৭ খৃঃ (Ghiasuddin Balban) ঃ উলুঘ খাঁ গিয়াসউদ্দিন বলবন নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইলতুৎমিসের ন্যায় তিনিও তুর্কীস্থানের বিখ্যাত ইলবারী জাতিভুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি মোঙ্গলদের হস্তে বন্দী হন এবং মোঙ্গলগণ তাঁহাকে বসরার

খাজা জালালউদ্দিনের নিকট বিক্রয় করে। জালালউদ্দিন তাঁহাকে সুলতান ইলতুৎমিসের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। পরবর্তীকালে বলবন সুলতানের বিখ্যাত চল্লিশ জন ক্রীতদাসের অন্তর্ভুক্ত হন এবং সুলতানের এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রিজিয়া তাঁহাকে 'আমীর-ই-শিকার' পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি রিজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আমীরগণকে সাহায্য করেন। ১২৪৬ খৃঃ তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। সুলতান নাসির-উদ্দিন তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।


গিয়াসউদ্দিন বলবন

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বলবন তুর্কী সামন্ত ও অভিজাতগণের ক্ষমতা খর্ব করেন তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা বাতিল করিয়া দেন। কয়েকজন আমীরকে তিনি গোপনে হত্যা করান এবং সম্ভ্রান্ত কয়েকজন আমীরকে অন্যায় কার্যের শাস্তি স্বরূপ প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। আমীরগণের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি বহু গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন।

অভিজাতগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সামরিক বিভাগের সংস্কার ও পুনর্গঠন করিয়া তিনি বিভিন্ন বিভাগের ভার উপযুক্ত নবীন ও প্রবীণ মালিকদের (সেনাপতি) হস্তে অর্পণ করেন। ইহার পর সুলতান কঠোর হস্তে মেওয়াটি রাজপুতগণের দস্যুতা দমন করেন এবং কাম্পিল, পাতিয়ালী ভোজপুর প্রভৃতি স্থানে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। দোয়াব অঞ্চলে প্রায় দুই হাজার অশ্বারোহী বেতনের পরিবর্তে জমিসত্ব ভোগ করিত। ইহাদের অধিকাংশের মৃত্যু হইলেও ইহাদের অকর্মণ্য অধিকারীগণ এই সকল সুযোগ ভোগ করিত। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে অতঃপর ইহাদের জায়গীরের পরিবর্তে ভাতা দেওয়া হইবে। কিন্তু দিল্লীর কোতোয়াল ফকরউদ্দিনের অনুরোধে এই নির্দেশ বাতিল করেন।

শৃংখলা স্থাপনে বিভিন্ন ব্যবস্থা

বলবনের সময় মোঙ্গলগণ একাধিকবার ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু সুলতান পূর্ব হইতেই মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞ সেনাপতি শেরখান একাধিক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত

করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করেন যে তাঁহার সাফল্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। একটানা মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সুলতান জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদকে মূলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মধ্যমপুত্র বুঘরা খানকে সামানা ও সুনামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং সীমান্তে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১২৭১ খৃঃ মুহম্মদ ও বুঘরা খানের মিলিত বাহিনীর হস্তে মোঙ্গলগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেও ১২৮৫ খৃঃ মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে মুহম্মদ নিহত হন। তাঁহাকে শহীদ উপাধি প্রদান করা হয়। সুলতান নিজে অগ্রসর হইয়া লাহোর পুনরুদ্ধার করেন।

মোঙ্গল আক্রমণ

১২৭৮ খৃঃ বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি সুলতানের প্রেরিত দুইটি অভিযান প্রতিহত করেন। অতঃপর সুলতান নিজে অগ্রসর হইয়া তুঘরিলকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং মধ্যমপুত্র বুঘরা খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদের মৃত্যুতে সুলতানের দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ১২৮৭ খৃঃ বলবনের মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ

সাফল্য ও কৃতিত্বের দিক হইতে বিচার করিলে বলবনকে দিল্লীর সুলতান-গণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। উদ্ধত তুর্কী আমীরদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এবং বিদ্রোহীদের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়া তিনি দিল্লীর সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি কর্তব্যপরায়ণ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সুযোগ্য শাসক ছিলেন। দিল্লীর রাজদরবারের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। বলবনের মৃত্যুর পর দাসবংশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কিন্তু দিল্লীর সুলতানিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব।

কৃতিত্ব

খল্‌জি বংশ (Khalji Dynasty)

জালালউদ্দিন ফিরোজ খল্‌জি (Jalaluddin Firuz Khalji) :

বলবনের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন দুর্বল এবং সিংহাসনের আরোহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। সাম্রাজ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং আমীর ওমরাহগণের মধ্যে দলাদলি দেখা দেয়। ১২৯০ খৃঃ খল্‌জি আমীরদলের নেতা জালালউদ্দিন ফিরোজ

খল্‌জি শেষ দাসবংশীয় সুলতান কায়ুমার্সকে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ খল্‌জি বংশ নামে পরিচিত।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে জালালউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তিনি তুর্কী ও খল্‌জি আমীরদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার অহেতুক উদারতার ফলে সর্বত্র অরাজকতা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন না করিয়া তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতেন। ইহাতে বুদ্ধিমান অভিজাতগণ বিরক্ত হন। তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই সন্দেহে তিনি সিদিমৌলা নামক একজন দরবেশকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অরাজকতা ও বিদ্রোহ

সুলতানের রণসম্ভারের অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু তিনি ঝাইন ও মান্দাবার অধিকার করেন। ১২৭২ খৃঃ প্রায় দেড়লক্ষ মোঙ্গল আবদুল্লার নেতৃত্বে ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া সুলতানের সহিত সন্ধি করে। মোঙ্গল নেতা উল্‌ঘু খাঁ তাঁহার অনুচরবর্গ সহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে বসতি স্থাপন করে। ইহারা নবমুসলমান নামে পরিচিত হয়। জালালউদ্দিনের সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযান। তিনি সুলতানের অনুমতি লইয়া মালব আক্রমণ করিয়া ভিলসা নগর অধিকার করেন। ইহার পর তিনি সুলতানের অগোচরে এবং তাঁহার বিনা-অনুমতিতে দেবগিরি আক্রমণ করিয়া রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করেন এবং প্রভূত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া কারায় ফিরিয়া আসেন। ইহার অল্পকাল পরে সুলতান বিশ্বাসী আমীর ওমরাহগণের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া আলাউদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কারায় উপনীত হইলে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সুলতানকে হত্যা করা হয়। ১২৯৬ খৃঃ ১৯শে জুলাই আলাউদ্দিন নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন।

বিভিন্ন অভিযান

মৃত্যু

আলাউদ্দিন খল্‌জী (Alauddin Khalji) : সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই আলাউদ্দিন মালব জয় করিয়াছিলেন এবং দেবগিরি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি প্রভূত উৎকোচ প্রদান করিয়া আমীর ওমরাহগণকে বশীভূত করেন। মৃত সুলতানের বিধবা পত্নী মালিকা জাহান তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহারা মূলতানে পলাইয়া যান।

জালালউদ্দিনের আত্মীয় পরিজনকে বন্দী করা হয়। আরকালি খাঁ, রুকন-উদ্দিনও উলঘু খাঁকে (মোঙ্গল) অন্ধ করিয়া দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হয়। আরকালি খাঁর পুত্রগণকে হত্যা করা হয়। মালিকা জাহানকে দিল্লীতে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয় এবং আহম্মদ চ্যাপকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

বিদ্রোহ দমন

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আলাউদ্দিন একাধিক বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র আকাত খাঁ, দুই ভাগিনেয় উমর খাঁ ও মঙ্গু খাঁ এবং হাজী মৌলার বিদ্রোহ দমন করেন। নব মুসলমানগণ তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সুলতানের নির্দেশে প্রায় ত্রিশ হাজার নবমুসলমানকে হত্যা করা হয়।

উদ্ভট পরিকল্পনা

সুলতান ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করিবার ফলে সাময়িকভাবে বাস্তববুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয় এবং হজরত মহম্মদের ন্যায় এক নূতন ধর্ম প্রবর্তনের সংকল্প করেন। কিন্তু দিল্লীর কোতোয়ালের উপদেশে তিনি এই সকল উদ্ভট পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিলেও পরবর্তীকালে তিনি মুদ্রার উপর নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডাররূপে অভিহিত করেন।

উত্তর ভারত অভিযান

উত্তর ও দক্ষিণভারতে আলাউদ্দিনের সামরিক অভিযানগুলি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। ১২৯০ খৃঃ উলুঘ খাঁ ও নসরত খাঁ গুজরাট জয় করেন। রাজা কর্ণদেব পলাইয়া যান কিন্তু রাণী কমলা দেবী মুসলমানদের হস্তে বন্দী হন। পরবর্তীকালে তিনি সুলতানের প্রিয় মহিষী হইয়াছিলেন। নসরত খাঁ কাম্বে লুণ্ঠন করেন। এখানে কাফুর নামে এক ক্রীতদাস তাঁহার হস্তে বন্দী হন। পরবর্তীকালে কাফুর আলাউদ্দিনের সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইহার পর সুলতান রণথম্ভোর অধিকার করেন। ১৩০৩ খৃঃ আলাউদ্দিন রাজধানী চিতোর সহ মেবার অধিকার করেন। ১৩০৫ খৃঃ আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনী মালব জয় করে। মাণ্ডু, ধারা, চান্দেরী ও উজ্জয়িনী মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উত্তর ভারত অভিযান সমাপ্ত করিয়া সুলতান দক্ষিণভারতে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। রামচন্দ্রদেব পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর প্রদান করেন নাই এবং গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণদেবকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই অজুহাতে ১৩০৬ খৃঃ মালিক কাফুরের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র-দেবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। রামচন্দ্রদেব বশ্যতা স্বীকার করেন এবং অধীন রাজা হিসাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। রাজা কর্ণের কন্যা দেবলা দেবীকে বন্দী

করিয়া দিল্লীতে পাঠানো হয় এবং সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁর সহিত তাহার বিবাহ হয়। ১৩০৮ খৃঃ কাফুর বরঙ্গলের কাকতীয় বংশীয় রাজা-দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেবকে পরাজিত করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। প্রতাপরুদ্রদেব প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করেন এবং বার্ষিক করপ্রদানে স্বীকৃত হন। ইহার পর ডোরাসমুদ্রের হোসমলরাজ তৃতীয় বীর বল্লাল কাফুরের হস্তে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সুলতানের অধীনতা স্বীকার করেন এবং বার্ষিক কর প্রদানে স্বীকৃত হন। ১৩১১ খৃঃ কাফুর পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন এবং সসৈন্যে মাদুরায় উপনীত হন এবং প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করেন। তিনি রামেশ্বরম পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং এখানকার হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। মাদুরায় একজন মুসলমান শাসক নিযুক্ত করিয়া কাফুর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ১৩১৩ খৃঃ কাফুর পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করিয়া রাজা শংকরদেবকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে সমগ্র দক্ষিণভারতে আধিপত্য বিস্তৃত হয়। আলাউদ্দিন দক্ষিণভারতের বিজিত রাজ্যগুলিকে উত্তরভারতের ন্যায় সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। তাহাদের আনুগত্য লাভ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে অভিযান

পূর্বেকার সুলতানদের ন্যায় আলাউদ্দিনকেও মোঙ্গল আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ১২৯৯ খৃঃ মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায়। ১৩০৩ খৃঃ মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারত আক্রমণ করে এবং দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া অকস্মাৎ ফিরিয়া যায়। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য আলাউদ্দিন সীমান্ত রক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করেন। ১৩০৫ খৃঃ গাজী মালিককে (পরবর্তীকালে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৩০৪ খৃঃ আলিবেগ ও খাজাতাসের নেতৃত্বে, ১৩০৬ খৃঃ কাবাকের নেতৃত্বে এবং ১৩০৭-৮ খৃঃ ইকবালমন্দের নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া যায়।

মোঙ্গল আক্রমণ



আলাউদ্দিন

আলাউদ্দিন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন। তিনি জায়গীর প্রথা বিলুপ্ত করেন। খাস ও ধর্মীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রজাদের নিকট হইতে যে কোন অজুহাতে অধিক অর্থ আদায়ের নির্দেশ দেন, যাহাতে তাহারা বিদ্রোহ করিবার কোন সুযোগ না পায়। তিনি বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করেন। অভিজাতদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা বন্ধ করিয়া দেন এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার আচরণ ছিল নিষ্ঠুর। হিন্দুদের নিকট হইতে নির্মম ভাবে অর্থ আদায় করা হইত। তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজকোষে জমা দিতে হইত। ভিটা কর ও গোচায়ণ কর দিতে হইত।

শাসন ব্যবস্থা

সামরিক বিভাগ হইতে দুর্নীতি দূর করিয়া তিনি এক শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সৈন্যদের জায়গীর দানের পরিবর্তে বেতন দানের ব্যবস্থা করা হয়। সৈন্যদের বেতনের হার ছিল কম। কম বেতনে যাহাতে তাহারা জীবনধারণ করিতে পারে তাহার জন্য জিনিষপত্রের দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নির্ধারিত মূল্যে যাহাতে জিনিষপত্র বিক্রয় হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য কয়েকজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

১৩১৬ খৃঃ সুলতান মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনেকে মনে করেন মালিক কাফুর তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। ইবন বতুতা তাঁহাকে দিল্লীর সুলতানগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বারণী তাঁহাকে নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু ও চক্রান্তকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন সন্দেহ নাই। নিকট আত্মীয়স্বজনদের তিনি নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছেন। প্রজাদের নির্যাতন ও নিপীড়ন করিয়াছেন। তিনি সন্দেহমনা, স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলেন। তথাপি তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। বারুণী, হাসান দেহল্‌বী প্রভৃতি মনীষীগণ তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর পর তিনি ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জায়গীর ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া তিনি শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার মৌলিক

কৃতিত্ব

চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার কঠোরতা ও নির্মমতার জন্য তিনি জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন ও আনুগত্যলাভে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

কুতুবউদ্দিন মুবারক খল্‌জি (Qutubuddin Mubarak Khalji) ঃ আলাউদ্দিন মৃত্যুর পূর্বে জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁকে বঞ্চিত করিয়া নাবালকপুত্র শিহাবউদ্দিন ওমরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান কিন্তু কার্যতঃ কাফুর ছিলেন সর্বেসর্বা। কাফুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আমীর ওমরাহগণের সহায়তায় কয়েকজন সৈন্য তাঁহাকে হত্যা করে। আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারক, ওমরের অভিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু ১৩১৬ খৃঃ ওমরকে অন্ধ করিয়া মুবারক সিংহাসন অধিকার করেন। মুবারক ছিলেন অলস ও বিলাস পরায়ণ। তিনি খুসরু নামক এক অনুচরের ক্রীড়ানক হইয়া পড়েন। স্থলতানের অযোগ্যতার ফলে সর্বস্ব বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৩২০ খৃঃ খুসরুর সৈন্যদের হস্তে মুবারক নিহত হইলে খল্‌জি বংশের অবসান হয়। নাসিরউদ্দিন খুসরু সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি অত্যাচারী ও ব্যাভিচারী ছিলেন। ১৩১০ খৃঃ গাজী মালিক তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। গাজী মালিক, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম তুঘলক বংশ।

তুঘলক বংশ ঃ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (Ghiyasuddin Tughluq) ঃ আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে গিয়াসউদ্দিন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

বিভিন্ন ব্যবস্থা

তিনি স্থশাসক ছিলেন। কৃষি এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। তিনি কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সৈন্য বিভাগে তিনি কঠোর শৃংখলা প্রবর্তন করেন। কিন্তু হিন্দুদের সম্পর্কে তিনি আলাউদ্দিনের ন্যায় কঠোর ও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করেন। তিনি বহু দুর্গ নির্মাণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণের পর বরঙ্গলের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় অভিযানে বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্র সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিলে স্বাধীন কাকতীয় বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।

অভিযান

এই সময় বাংলাদেশের সিংহাসন লইয়া সামসুদ্দিন ফিরোজশাহের তিন পুত্র শিহাবউদ্দিন, নাসিরউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৩২৪ খৃঃ সুলতান সসৈন্যে বাংলাদেশে উপনীত হন এবং নাসিরউদ্দিনকে সিংহাসনে বসান। বাংলাকে দিল্লীর প্রত্যক্ষশাসনে আনয়ণ করা হইল। বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে আফগানপুরে তোরণসহ মণ্ডপ তাঁহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনেকে মনে করেন ইহার পিছনে জুনা খাঁর চক্রান্ত ছিল।

বাংলাদেশ

মুহম্মদ বিন তুঘলক (Muhammad Bin Tughluq): পিতার মৃত্যুর পর জুনা খাঁ ১৯২৫ খৃঃ মুহম্মদ বিন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি বিদ্রোহ এবং নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। সুলতান বিদ্রোহগুলি দমন করেন।

শাসনব্যবস্থার উন্নতি ও করবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সুলতান গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন এবং নতুন কর ধার্য করেন। ইহার ফলে প্রজাদের দুর্দ্দশা চরমে ওঠে। এমন কি দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও রাজকর্মচারীগণ কঠোর ভাবে কর আদায় করিতে থাকেন। ফলে চাষী গণ বনে জঙ্গলে পলাইয়া যায়। সুলতানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাঁহার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়।

দোয়াবে করবৃদ্ধি

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য সুলতান রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। দেবগিরির নাম রাখা হয় দৌলতাবাদ। দিল্লীর অধিবাসী-গণকে তিনি দেবগিরি যাইবার নির্দেশ দেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু সাত-শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে যাইয়া অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুলতান পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দিল্লীর পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসিল না।

রাজধানী পরিবর্তন

ইহার অল্পকাল পরেই মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে। সুলতান ইহাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি মোঙ্গলদের সন্তুষ্ট করেন। ইহা তাঁহার দুর্বলতার পরিচয়।

সুলতানের কার্যাবলীর মধ্যে তাম্রনোট প্রবর্তন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা ব্যর্থ হয়। কারণ জাল নোটে বাজার ভর্তি হইয়া যায়। সুলতান পূর্বে কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে লাগিল। বাধ্য হইয়া সুলতান স্বর্ণ ও রৌপ্য

তাম্র নোট প্রবর্তন

দিয়া জাল নোট কিনিয়া লইলেন। রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। একইভাবে স্থলতানের খোরাসান বিজয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অথচ ইহার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ১৩৩৭ খৃঃ স্থলতান নগরকোট জয় করেন। কিন্তু কারাজল অভিযানে তাঁহার সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হয়। স্থলতান চীন সম্রাটের সহিত দূত বিনিময় করেন এবং ইবন বতুতাকে চীনে প্রেরণ করেন।

স্থলতানের ব্যর্থ নীতির ফলে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলাদেশ স্থলতানের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। মাবার স্বাধীন হইয় যায়। কারা, বিদর, গুলবর্গা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্য স্থাপিত হয়। ১৩৫১ খৃঃ স্থলতান মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ব্যর্থতার জন্য অনেকে মুহম্মদ বিন তুঘলককে উন্মাদ, রক্তপিপাসু, স্বপ্নবিলাসী নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বারণী এবং ইবন বতুতা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ সেনাপতি। তিনি সরল জীবন-যাপন করিতেন এবং ধর্মপ্রাণ ছিলেন। কিন্তু শাসক হিসাবে তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অস্থির-চিত্ত ও কোপন-স্বভাব। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাব ছিল। ধৈর্যহীনতা, ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি ও বাস্তব বুদ্ধির অভাবে তাঁহার পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হইয়াছিল।

ফিরোজ তুঘলক (Firuz Tughluq) ঃ তাট্টার নিকটে মুহম্মদ তুঘলক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দারুণ বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। দেশের চতুর্দিকে তখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলিতেছিল। মুহম্মদ তুঘলকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তখন সৈন্যশিবিরে অবস্থিত আমীর ওমরাহগণ গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা, ব' এর পুত্র ফিরোজ তুঘলককে স্থলতান মনোনীত করিলেন। ১৩৫২ খৃঃ ফিরোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাঁহার মধ্যে ধর্মানুরাগ, সত্যবাদিতা, দয়া প্রভৃতি বহুবিধ গুণ থাকিলেও তিনি ছিলেন ধর্মান্ধ। এইজন্য রাজনৈতিক দিক হইতেও তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন। যদিও সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে আদর্শ মুসলমান নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্থলতান কোন সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময় বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া যায়। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহকে স্থলতান পরাজিত করিতে পারেন নাই। স্থলতান সিকন্দরকে বাংলার শাসক হিসাবে স্বীকার করিয়া লন। তিনি জাজনগর বা উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। উড়িষ্যার

হিন্দুরাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির অপবিত্র করেন এবং জগন্নাথদেবের মূর্তি বিনষ্ট করেন। ১৩৬১ খৃঃ তিনি নগর-কোট অধিকার করেন। ১৩৬২ খৃঃ সুলতান সিন্ধুর তাট্টা অঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাট্টার শাসক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু সুলতান দাক্ষিণাত্য পুনরধিকার করিতে পারেন নাই। বহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুইটির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সুলতান গুজরাট এবং কাথের নামক স্থানের বিদ্রোহ দমন করেন।

সুলতানের ধর্মান্ধতার ফলে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। তিনিই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করিয়াছিলেন। শিয়া, মেহদুই, সুফী প্রভৃতি মতবাদের অনুগামীদের উপর তিনি নির্যাতন করিতেন। শাসনব্যবস্থায় তিনি বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। ফলে জিনিষপত্রের মূল্য কমিয়া যায় এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়। বহুবিধ দুর্নীতি প্রবেশ করিবার ফলে তাঁহার সৈন্যবাহিনী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রায় চল্লিশ হাজার ক্রীতদাস ছিল। ফিরোজ ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য তিনি প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য শাসক, ফলে সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৪১৩ খৃঃ নাসিরউদ্দিন মামুদশাহের মৃত্যু হইলে তুঘলক বংশের অবসান হয়।

সৈয়দ ও লোদি বংশ (The Sayyids and the Lodis)ঃ তৈমুরের প্রতিনিধি এবং মূলতান ও লাহোরের শাসনকর্তা খিজির খাঁ সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ক্ষমতা দিল্লী, দোয়াব ও পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার মন্ত্রী বহলুল লোদী সিংহাসন অধিকার করেন।

বহলুল লোদীর প্রতিষ্ঠিত বংশ লোদী বংশ নামে পরিচিত। বহলুল দোয়াব, জৌনপুর, কালপী, ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়র অধিকার করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক এবং উচ্চাভিলাষী। ১৪৮৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র নিজাম খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জৌনপুরের বিদ্রোহ দমন করিয়া জৌনপুর অধিকার করেন। ইহার পর তিনি বিহার অধিকার করিয়া বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সহিত তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। সিকন্দর শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং উদ্ধত আমীর-ওমরাহগণের ক্ষমতা

বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্মান্ধ। মথুরার হিন্দুমন্দিরগুলি তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন। ১৫০৪ খৃঃ তিনি আগ্রা শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৫১৭ খৃঃ তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উদ্ধত ও অদূরদর্শী শাসক ছিলেন। ক্ষমতালোভী আমীর ওমরাহগণের সহিত তাঁহার তীব্র সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। তিনি আমীরগণকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। বিদ্রোহী আমীরগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ইহার পর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলতখান লোদী ও ইব্রাহিমের পিতৃব্য আলম খান বাবরকে ভারত আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন। ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম বাবরের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Sultanate) ঃ তুর্ক-আফগান সুলতানগণ তিন শতাব্দীরও অধিককাল ভারতে রাজত্ব করেন কিন্তু তুঘলক বংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সুলতানি সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসননীতি ও চরিত্রের ত্রুটির জন্য সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সূচনা হয়। তাঁহার পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘলকও সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা ও ধর্মান্ধ। তিনি সুদক্ষ শাসক হইলে হয়ত সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন হইত না। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন দুর্বল, অকর্মণ্য ও অযোগ্য। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মুহম্মদ তুঘলকের সময় হইতেই অনেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে থাকে। পূর্বের ন্যায় অভিজাতগণের মধ্যে শৌর্য, বীর্য ও দক্ষতা ছিল না। বিলাসপরায়ণ ও অকর্মন্য অভিজাত শ্রেণী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিস বলবন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ন্যায় প্রতিভাশালী ক্রীতদাসগণ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালের ক্রীতদাসগণ অকর্মণ্য ও অপদার্থ ছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিও ইহার পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন শাসনতান্ত্রিক সংহতি গড়িয়া ওঠে নাই। দুর্বল সুলতানগণের সময় বিদ্রোহ ও অশান্তি দেখা দিত। সুলতানগণের হিন্দু-বিরোধী নীতি সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। হিন্দু রাজগণ সুযোগ পাইলেই বারংবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। হিন্দুমন্দিরগুলি ধ্বংস

ও লুণ্ঠন করিয়া এবং নানাভাবে নির্যাতন করিয়া হিন্দু ও রাজপুতগণকে বিদ্রোহের পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন। সর্বশেষে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের ফলে সুলতানি সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহার অল্পদিন পরেই তৈমুরের পদচিহ্ন ধরিয়া বাবর ভারতে প্রবেশ করেন এবং পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

মুঘল বংশ ঃ (Mughal Dynasty)

বাবর ঃ ১৫২৬-৩০খৃঃ (Babur) ঃ ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৮৩ খৃঃ বাবরের জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন ফরগনার অধিপতি। বাল্য-কালেই পিতার মৃত্যুর পর তিনি সমরখন্দ ও ফরগনা হইতে বিতাড়িত হন। ১৫০৪ খৃঃ তিনি কাবুল অধিকার করেন। ইহার পর তিনি পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৫২২ খৃঃ তিনি কান্দাহার অধিকার করেন। ১৫১৯ ও ১৫২০ খৃঃ তিনি সীমান্তের উপজাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫২৪ খৃঃ দৌলতখান লোদী ও আলম খান তাঁহাকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান। বাবর সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু দৌলতখান যখন দেখিলেন যে বাবর ভারতে রাজ্য বিস্তার করিতে ইচ্ছুক তখন তিনি বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বাধ্য হইয়া বাবর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু ১৫২৫ খৃঃ তিনি ১২০০০ সৈন্য লইয়া কাবুল হইতে অগ্রসর হন। ইব্রাহিম লোদীও প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহাকে বাধ্য প্রদান করেন। ১৫২৬ খৃঃ ১লা এপ্রিল পাণিপথের প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আফগান সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। ইব্রাহিম লোদী এই যুদ্ধে নিহত হন।

অতঃপর বাবরকে শক্তিশালী রাজপুতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইল। মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ ভারতে রাজপুত সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ১৫২৭ খৃঃ রাজপুতগণ ও বাবরের সৈন্যবাহিনী খানুয়ার প্রান্তরে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। রাজপুতগণ অভূতপূর্ব শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় প্রদান করিলেও মুঘল সৈন্যবাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। ইহার ফলে ভারতে রাজপুত সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা বিলীন হইল। ইহার পরই সংগ্রামসিংহের বিশ্বস্ত অনুচর মেদিনীরাইকে পরাজিত করিয়া বাবর চান্দেরী দুর্গ অধিকার করেন। পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া বাবর বিহার অধিকার করিলেন। ১৫২৯ খৃঃ গোগরার যুদ্ধে বাবরের সৈন্যবাহিনী বাংলার সুলতান

নসরত শাহ ও আফগানদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া ভারতে আফগান আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সাময়িক ভাবে বিনষ্ট করিল।

১৫৩০ খৃঃ বাবরের মৃত্যু হয়। তিনি অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার ফলে অক্ষু নদী হইতে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মুষ্টিমেয় অনুচরকে সঙ্গে লইয়া কাবুল ও কান্দাহার বিজয় এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পাণিপথ, খানুয়া ও গোগবার যুদ্ধে জয়লাভ করা তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচয়। তিনি ছিলেন কবি ও সুসাহিত্যিক। তাঁহার আত্মজীবনী একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

হুমায়ুন ঃ ১৫৩০-৫৬ খৃঃ (Humayun) ঃ ১৫৩০ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। নিজের ভ্রাতাগণকে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের সংকট মুহূর্তে তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।


হুমায়ুন

হুমায়ুন প্রথমেই কালিঞ্জর দুর্গের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ইহার পর হুমায়ুন পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া দাউরুয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে পরাজিত করেন। অতঃপর হুমায়ুন শেরশাহের নিকট হইতে চুনার দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হন। কয়েকমাস অবরোধের পর শেরশাহ আত্মসমর্পণ করেন। গুজরাটের বাহাদুর শাহ মালব অধিকার করিবার পর চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন। চিতোরের রাণা হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন ১৫৩৪ খৃঃ বাহাদুর শাহের এক সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। বাহাদুর শাহ নিজে মান্দাশোরের যুদ্ধে হুমায়ুনের নিকট পরাজিত হইলেন। হুমায়ুন গুজরাট ও মালব অধিকার করিলেন। হুমায়ুন আহম্মদাবাদ অধিকার

রাজ্যবিস্তার

করিবার পর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে পর্তুগীজদের সাহায্যে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনরধিকার করিলেন। মালবের স্থানীয় সামন্তগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। বাহাদুর শাহ অল্পদিনের মধ্যেই পর্তুগীজদের হস্তে নিহত হইলেন।

শেরশাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

কিন্তু পূর্বদিকে শেরশাহ হুমায়ুনের অনুপস্থিতির সুযোগে রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন। ১৫৩৪ খৃঃ শেরশাহ সুলতান মামুদশাহ ও লোহানীদের মিলিত বাহিনীকে সুরজগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ১৫৩৭ খৃঃ তিনি বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড় অবরোধ করিলেন। গৌড় অধিকার করিবার পর তিনি রোটাস দুর্গ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন চুনার অধিকার করিয়া গৌড়ে উপনীত হইলেন। শেরশাহ রোটাস দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন এবং হুমায়ুনের অনুপস্থিতির সুযোগে বেনারস হইতে কনৌজ পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়া লইলেন। হুমায়ুন এক শক্তিশালী বাহিনী লইয়া শেরশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চৌসার যুদ্ধে তিনি শেরশাহের নিকট পরাজিত হইলেন (১৫৩৯ খৃঃ)। শেরশাহ স্বাধীন নরপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পর বৎসর কনৌজের নিকট হরদই এর যুদ্ধে হুমায়ুন পুনরায় শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন। ভ্রাতাগণ হুমায়ুনকে সাহায্য করিলেন না। বরং তাঁহার বিরোধিতা করেন। হুমায়ুনকে কেহ সাহায্য করিলেন না। প্রাণভয়ে ভীত হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করিলেন।



শেরশাহ

হুমায়ুনের পলায়নের পর শেরশাহ সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি পাঞ্জাব, সিন্ধু, গোয়ালিয়র, মালব ও মূলতান অধিকার করিলেন। রাজপুতনায় আজমীর, যোধপুর, আবু এবং চিতোরে আফগান সৈন্য মোতায়েন করিলেন। ১৫৪৫ খৃঃ কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিবার সময় এক দুর্ঘটনায় শেরশাহের মৃত্যু হয়।

শেরশাহ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শাসনব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা ছিল প্রজাকল্যাণমূলক। উলেমাদের প্রভাব হইতে তিনি নিজেকে

মুক্ত রাখিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন স্থলতান স্বয়ং। শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী ছিল। দেওয়ান-ই-কাজী এবং দেওয়ান-ই-বারিদ নামে দুইজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্য ৪৭ টি সরকার বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সরকারের শাসনভার 'শিকদার-ই-শিকদারণ' এবং 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' নামক দুইজন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। পরগণার শাসনভার আমীন, সিকদার এবং আরও কয়েকজন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সমস্ত জমি জরিপ করা হইয়াছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। রাজস্ব আদায়ের জন্য আমীন, মুকাদ্দম, শিকদার কানুনগো এবং পাটোয়ারী নামীয় কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শেরশাহ সরকার ও প্রজাদের মধ্যে জমির সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য কবুলিয়ত এবং পাট্টা প্রথার প্রবর্তন করেন। শেরশাহ জায়গীর প্রথার বিলোপ করেন। দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি বহু প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করান। ইহার মধ্যে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের খবরাখবর নিয়মিত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরাইখানাগুলি ডাকচৌকী রূপে ব্যবহৃত হইত। তাঁহার সময় ঘোড়ার পিঠে করিয়া ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি পুলিশ ও মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। শেরশাহ বিচার ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিলেন শেরশাহ নিজে। বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কাজী, মির-ই-আদল, আমীন, প্রধান কাজী, সদর প্রভৃতি কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শেরশাহ সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং এক সুশৃংখল সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। তিনি যুদ্ধের ঘোড়ায় দাগ দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

শেরশাহের শাসনব্যবস্থা

বিভিন্ন সংস্কার

কিন্তু শেরশাহের মৃত্যুর পরই তাহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ উপযুক্ত ছিলেন না। আফগানদের মধ্যে দলাদলির সুযোগে ১৫৪৫ খৃঃ হুমায়ুন পারসিক সৈন্যের সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার পুনরধিকার করেন। ১৫৫৫ খৃঃ তিনি লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৫৫৬ খৃঃ লাইব্রেরীর সিঁড়ি হইতে পতনের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহামতি আকবর (Akbar the Great) ঃ আকবর নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খান। সিংহাসনে আরোহণের পরই আকবরকে মুহম্মদ আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর সহিত সংঘর্ষে উপনীত হইতে হইল। দিল্লীর শাসনকর্তা তারদি-বেগ খানকে পরাজিত করিয়া হিমু পাণিপথের প্রান্তরে আকবরের সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর নেতৃত্বাধীন আফগান বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হইল (১৫৫৬ খৃঃ)। হিমু নিহত হইলেন। ভারতে আফগান শক্তির সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হইল। ইহার পর খুব অল্পদিনের মধ্যে আকবরের শূরবংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নিশ্চিহ্ন হইলেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করার মূলে বৈরামের অবদান অসামান্য। কিন্তু তিনি ছিলেন শিয়া। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমানগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত। ১৫৬০ খৃঃ আকবর স্বহস্তে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বৈরামকে মক্কা যাইবার নির্দেশ প্রদান করেন। বৈরাম বিদ্রোহী হন। কিন্তু পরাজিত ও ধৃত হন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং মক্কা যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু পথে আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। ১৫৬০-৬২ খৃঃ মধ্যে আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম অনাথা এবং তাঁহার পুত্র আদম খাঁ তাঁহার শাসনব্যবস্থায় অবৈধ প্রভাব বিস্তার করেন। এই সময়কে 'পেটিকোট গভর্ণমেণ্ট' বা নারী প্রভাবিত শাসনকাল বলা হয়। ১৫৬২ খৃঃ আকবর হারেমের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈরাম খাঁ

উত্তর-ভারত বিজয় ঃ পাণিপথের যুদ্ধের পর আকবর গোয়ালিয়র, জৌনপুর ও আজমীর অধিকার করেন এবং দিল্লী ও আগ্রায় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৬২ খৃঃ অম্বরের রাজা বিহারীমল তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আকবরের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিহারী-মল তাঁহার পুত্র ভগবানদাস এবং পৌত্র মানসিংহকে মনসবদার পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৫৬৪ খৃঃ আকবর গণ্ডোয়ানা রাজ্য অধিকার করেন। ১৫৬৭ খৃঃ রাণা উদয়সিংহকে পরাজিত করিয়া আকবর চিতোর অধিকার করেন। অতঃপর মুঘল সৈন্যবাহিনী রণথম্ভোর, কালিঞ্জর এবং গুজরাট অধিকার করে। ১৫৭৩ খৃঃ আকবরের সৈন্যবাহিনী সুরাট অধিকার করে। মক্কাযাত্রী মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য আকবর ও পর্তুগীজদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ

বৎসরই গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু আকবর বিদ্রোহীদের পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। এই সময় বাংলাদেশে দাউদ কররাণী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আকবর নিজে পাটনা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দাউদের সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর মুনিম খাঁ ও টোডরমলকে বাংলাদেশ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করা হইল। ১৫৭৬ খৃঃ রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও দীর্ঘদিন যাবৎ বারোভূঁইয়াগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃঃ মুঘল সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যা অধিকার করে। কিন্তু আকবরকে দীর্ঘস্থায়ী রাজপুত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। মেবারের রাণা উদয়সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি বারংবার মুঘল সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি মুঘল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। ১৫৯৭ খৃঃ মৃত্যুর পূর্বে তিনি চিতোর, আজমীর ও মান্দালগড় ব্যতীত প্রায় সমগ্র রাজ্য পুনরধিকার করেন। ১৫৮০ খৃঃ আকবরের শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতিবাদে বাংলা ও বিহারের মুঘল কর্মচারিগণ বিদ্রোহ করে। কিন্তু আকবরের সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা মহম্মদ হাকিম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু আকবর সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া কাবুল পুনরধিকার করেন। ১৫৮৫ খৃঃ হাকিমের মৃত্যুর পর কাবুল আকবরের শাসনাধীন হয়। আকবর সিন্ধু, বেলুচিস্থান, কান্দাহার ও কাশ্মীর অধিকার করেন।

বাংলা অধিকার

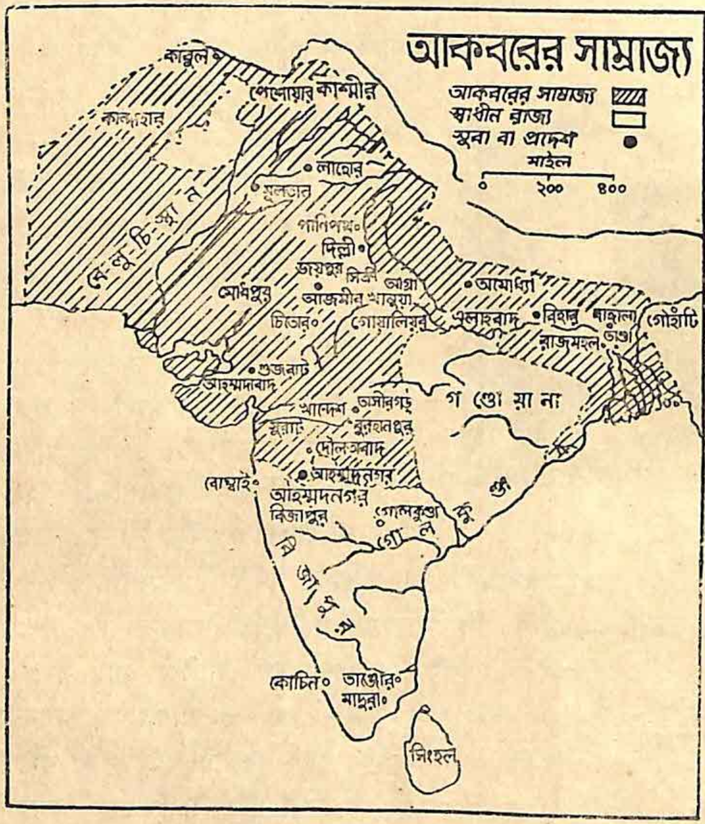


রাণা প্রতাপ

রাজপুতযুদ্ধ

দক্ষিণ-ভারত বিজয়ঃ উত্তর-ভারতের পর আকবর দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ে অগ্রসর হন। দাক্ষিণাত্যের চারিটি মুসলমান রাজ্য খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করাই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। খান্দেশ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৫৯৪ খৃঃ মুঘল সৈন্য বাহিনী আহম্মদনগর অবরোধ করে। আহম্মদনগরের নাবালক সুলতানের অভিভাবিকা ও বিজাপুরের রাজমাতা চাঁদবিবি মুঘল সৈন্যবাহিনীকে বাধা প্রদান করেন। উভয়-

পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধির সর্ত অনুযায়ী বেরার আকবরের হস্তগত হয় এবং আহম্মদনগরের সুলতান আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু



শীঘ্রই আহম্মদ-নগরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু মুঘল সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমন করিয়া আহম্মদনগর অধিকার করে। ১৫৯৯ খৃঃ মুঘল সৈন্যবাহিনী বুরহানপুর অধিকার করে। ১৬০১ খৃঃ আসিরগড় দুর্গ মুঘলদের হস্তগত হয়। দাক্ষিণাত্যের শাসনভার যুবরাজ দানিয়েলের হস্তে অর্পণ করা হয়। আবদুর রহিম তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন।

সুলতানি রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান

আকবরের শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। বন্ধু ফৈজী লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। সেলিমের প্ররোচনায় আবুল ফজল নিহত হন। সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত সেলিমের সহিত আকবরের মিলন হইয়াছিল। ১৬০৫ খৃঃ আকবরের মৃত্যু হয়।

শেষ জীবন

হিন্দুদের প্রতি আকবরের নীতি (Akbar's Policy towards the Hindus) ঃ সমগ্র ভারতে একটি জাতীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আকবর হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি ভারতের অগণিত হিন্দু ও রাজপুত জনসাধারণের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং মন্দির নির্মাণ ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন নাই। হিন্দু ও রাজপুতদের সহিত তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি রাজপুতদের সামরিক ও অসামরিক উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ফলে রাজপুতদের আনুগত্য-লাভে সমর্থন হন। মেবার ব্যতীত অন্যান্য রাজপুত রাজগণ আকবরের অধীনে মনসবদারী (সৈন্যাধ্যক্ষ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদার ধর্মনীতি অনুসরণ করিয়া আকবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে এই নীতি ছিল অভ্রান্ত।

ধর্মমত (Religious Views) ঃ আকবরের আদর্শ এবং চিন্তাধারা ও ধর্মীয় উদারতা বিভিন্ন কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাতার প্রভাবে তাঁহার মধ্যে ধর্মীয় উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতার বীজ রোপিত হইয়াছিল। আকবর ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সুফী মতবাদের সান্নিধ্যে আসিবার ফলে শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী হইয়াছিলেন। আকবরের গৃহশিক্ষক তাঁহার মনে উদার মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজপুত স্ত্রীগণের প্রভাবে ও হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন বিশেষতঃ ভক্তিবাদের দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। আকবর ছিলেন সত্য-সন্ধানী। সাম্রাজ্যের সকলকে এক ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেশ্যে সকল ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া সকলের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য এক নূতন ধর্ম প্রবর্তনের জন্য তিনি নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ১৫৭৫ খৃঃ শেখ মুবারক ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ফৈজী ও আবুল ফজলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবার ফলে তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তিত হইতে থাকে। ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদৎখানা বা উপাসনা-গৃহ নির্মাণ করিয়া আকবর



আকবর

বিভিন্নধর্মের জ্ঞানী ব্যক্তিদের ধর্মালোচনার জন্য আহ্বান করিতেন। এইসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের আলোচনা শুনিবার পর আকবর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে সকল ধর্মের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। ১৫৭৯ খৃঃ আকবর ফতেপুর সিক্রীর প্রধান উলেমাকে পদচ্যুত করেন এবং 'অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা' বা 'ইনফলেবিলিটি ডিক্রী' নামে এক দলিল প্রচারিত করিয়া রাষ্ট্রশাসন ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পরে আকবর সকল ধর্মের সারবস্তু লইয়া "দীন এলাহী" নামে একেশ্বরবাদী এক নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়া এই ধর্মমত প্রবর্তন করেন নাই। মৌলানা বদায়ুনী, স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ নূতন ধর্মপ্রবর্তনকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন।

অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা ; দীন এলাহী

কিন্তু জার্মান ঐতিহাসিক ভন নোয়ের আকবরের ধর্মমতের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে মানুষের মধ্যে ভগবান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বদায়ুনী ও জেস্থইট লেখকগণ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, আকবর ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর কখনও কোরাণকে অস্বীকার করেন নাই। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনাই ছিল তাঁহার আদর্শ।

মানুষের মধ্যে ভগবান

সুদক্ষ যোদ্ধা, উদার, বিজ্ঞ এবং কল্যাণকামী শাসক, উচ্চ আদর্শের অধিকারী আকবর ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার মধ্যে বহু গুণের সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি ছিলেন অসমসাহসী ও অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী। তিনি সম্ভবতঃ লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তিনি জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি ও স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শিল্প কলা ও স্থাপত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। সমগ্র উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণ ভারতের একাংশব্যাপী তিনি যে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের পরিচয়। হিন্দুদের প্রতি উদারনীতি অনুসরণ করিয়া তিনি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করেন। সম্রাটের চক্ষে সকল প্রজাই ছিল সমান। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

কৃতিত্ব

জাহাঙ্গীর : ১৬০৫-২৭ খৃঃ (Jahangir) : ১৬০৫ খৃঃ আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম "নূরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদিশাহ গাজী" নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের সর্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হইল পুত্র খুসরুর বিদ্রোহ। কিন্তু খুসরুর

খুসরুর বিদ্রোহ

পরাজিত হন, তাঁহাকে অন্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। খুসরুকে সাহায্য করিবার অপরাধে শিখগুরু অর্জুনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফলে শিখ সম্প্রদায় মুঘল শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে।

জাহাঙ্গীর মেবার বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। রাণা প্রতাপ সিংহের পর তাঁহার পুত্র অমর সিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় সাহসী ছিলেন না। তিনি মুঘল সম্রাটের সহিত সন্ধি স্বাক্ষর করেন। রাণা মুঘল সৈন্যবাহিনীতে একহাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ করণ পাঁচহাজার সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত হন। জাহাঙ্গীরের সময় বাংলাদেশের শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ বারো ভুঁইয়াদের ক্ষমতা ধ্বংস করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬২০ খৃঃ মুঘল সৈন্যবাহিনী কাংড়া অধিকার করে।

রাজ্যবিস্তার মেবারে ও বাংলাদেশ

দক্ষিণ ভারতে জাহাঙ্গীর পিতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আহম্মদনগরের একাংশে দ্বিতীয় মূর্তাজাশাহ মন্ত্রী মালিক অম্বরের সাহায্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। মালিক অম্বর মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ১৬১১ খৃঃ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত ছিলেন। একত্রিত হইয়া মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু যুবরাজ খুরমের হস্তে ১৬১৬ খৃঃ পরাজিত হন। খুরম শাহজাহান উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু মুঘল সৈন্যবাহিনী কোন নূতন অঞ্চল অধিকার করিতে পারে নাই। পুনরায় শাহজাহানের হস্তে পরাজিত হইয়া মালিক অম্বর বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে মালিক অম্বর তাঁহার সহিত যোগদান করেন। কিন্তু শাহজাহান বশ্যতা স্বীকার করিলে মালিক অম্বর পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। ১৬২২ খৃঃ পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাসের সৈন্যবাহিনী কান্দাহারঅধিকার করিয়া লয়। জাহাঙ্গীর ইহা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই।

দক্ষিণ ভারত অভিযান

মালিক অম্বর

১৬১১ খৃঃ হইতে ১৬২৭ খৃঃ পর্যন্ত নূরজাহানই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সকল শাসন ক্ষমতার অধিকারিণী। নূরজাহানের পূর্বনাম ছিল মেহেরউন্নিসা। তাঁহার স্বামী শের আফগান বর্ধমানের জায়গীরদার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীর হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলে মেহেরউন্নিসাকে শিশুকন্যাসহ রাজধানীতে প্রেরণ করা হয়। ইহার চারিবৎসর পর জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে

নূরজাহানের প্রভাব

বিবাহ করেন এবং তাঁহার নাম রাখেন নূরজাহান। নূরজাহান ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষিনী। তাঁহার পিতা ইতিমদউদ্দৌলা, ভ্রাতা ইতিকাদ খাঁ (আসফ খাঁ) উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শের আফগানের ঔরসজাত কন্যার সহিত যুবরাজ শারিয়ারের বিবাহ প্রদান করিয়া তিনি নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। আসফ খাঁর কন্যা মমতাজমহলের সহিত শাহজহানের বিবাহ হয়। তাঁহার সীমাহীন ক্ষমতা বৃদ্ধিও ক্ষমতাপ্রিয়তার ফলে দলাদলি ও চক্রান্ত সুরু হয়। যুবরাজ শাহজাহান ও সেনাপতি মহবত খাঁ বিদ্রোহী হন। নূরজাহান যুবরাজ শারিয়রকে সিংহাসনে বসাইবার চক্রান্ত করিতেছিলেন। শাহজাহান ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরাজিত হন। সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করেন। সেনাপতি মহবত খাঁ নূরজাহানের চক্রান্তে ভীত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং ঝিলাম নদীর তীরে সম্রাটকে বন্দী করেন। কিন্তু নূর-জাহান কৌশলে তাঁহাকে মুক্ত করেন। মহবত খাঁ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন।



জাহাঙ্গীর

শাহজহান ও মহবত খাঁর বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীর বুদ্ধিমান, সুকৌশলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন দরদী ও সহানুভূতিশীল। তিনি বহু শুল্ক ও কর উঠাইয়া লন। জাহাঙ্গীর সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনী একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তিনি অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় হইয়া পড়েন। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না কিন্তু ধর্মপরায়ণ ছিলেন। অনেক সময় ধৈর্য্যহীনতার ফলে তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কৃতিত্ব

শাহজাহান : ১৬২৮-৫৮ খৃঃ (Sahajahan) : জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নূরজাহানের সহায়তায় যুবরাজ শারিয়ার লাহোরে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। কিন্তু শাহজাহানের সমর্থক মমতাজমহলের পিতা আসফ খাঁ গোপনে শাহজাহানকে দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লী আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন এবং সাময়িকভাবে মৃত যুবরাজ খুসরুর পুত্র দাওয়ার বকস্‌কে সিংহাসনে বসাইলেন। অতঃপর তিনি শারিয়ারকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। ১৬২৮ খৃঃ শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ

সিংহাসনে আরোহণ

করিলেন। দাওয়ার বকস্ পারস্যের শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শাহজাহান সম্ভাব্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পৃথিবী হইতে সরাইয়াছিলেন।

কান্দাহার পুনরধিকারে ব্যর্থ

শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বারংবার কান্দাহার পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। অথচ এই অভিযানগুলির জন্য বারো কোটি টাকা ব্যয় হয় ও প্রচুর সৈন্য বিনষ্ট হয়। শাহজাহান বলখ্, বদাখ্শান ও সমরখন্দ বিজয়ের জন্য ১৬৪৬ খৃঃ মধ্য এশিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন। সামরিক সাফল্য অর্জন করিলেও মুঘল বাহিনী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। এক ইঞ্চি জমিও দখল করা সম্ভব হইল না। অথচ চার কোটি টাকা ও কয়েক সহস্র সৈন্য ধ্বংস হইল। সিংহাসনে আরোহণের পর অবশ্য শাহজাহান বুন্দেলার রাজপুত নেতা জুজার সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের আফগান নেতা খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করেন। এই সময় পর্তুগীজদের জলদস্যুতার ফলে বাংলাদেশে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা ঘৃণ্য দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিল। শাহজাহানের নির্দেশে বাংলার শাসনকর্তা কাশিম আলি খাঁর পুত্র পর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী দখল করেন এবং তাহাদের শক্তি বিনষ্ট করেন।

মধ্য এশিয়া নীতি ব্যর্থ, পর্তুগীজদের দমন

দাক্ষিণাত্য অভিযান

শাহজাহান পিতা ও পিতামহের পদাংক অনুসরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হন। আহম্মদনগরের সুলতান দ্বিতীয় মূর্তজা শাহ ও মন্ত্রী ফতেখাঁর মধ্যে বিরোধের সুযোগে মুঘল সৈন্যবাহিনী ১৬৩৩ খৃঃ আহম্মদনগর অধিকার করিয়া লয়। সুলতান হুসেন শাহকে (দ্বিতীয় মূর্তাজার পুত্র) বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে রাখা হয়। অতঃপর গোলকুণ্ডার সুলতান মুঘল বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং বার্ষিক করপ্রদানে স্বীকৃত হন। ১৬৩৬ খৃঃ বিজাপুরের সুলতানও মুঘলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। সম্রাট তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা সুকোর বিরোধিতা ও শত্রুতায় ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু পুনরায় তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর সাহায্যে তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। এই সময় গোলকুণ্ডার সুলতান ও মন্ত্রী মীরজুমলার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ইহার সুযোগে ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্রাটের নির্দেশে রাজধানীর অবরোধ তুলিয়া লইলেন। সুলতান সম্রাট

শাহজাহানকে দশ লক্ষ টাকা ও রঙ্গীর জেলা ছাড়িয়া দিলেন। মীরজুমলা পরবর্তী কালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু দারা স্থকোর নির্দেশে সম্রাট যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেন। সুলতান কল্যানী, বিদর, পেরেণ্ডা মুঘল সম্রাটকে অর্পণ করিলেন ও প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

১৬৫৭ খৃঃ সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে রক্তাক্ত সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মধ্যম পুত্র সুজা, দারার পুত্র সুলেমানের হস্তে পরাজিত হইয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া যান। পরে খাজোয়ার যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি আরাকানে পলাইয়া যান। সেখানে তিনি আরাকানীদের হস্তে সপরিবারে নিহত হন। ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার জন্য এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইহাদের মিলিত সৈন্যবাহিনী ধরমতের যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিল। ইহার পর ১৬৫৭ খৃঃ সামুগড়ের প্রান্তরে ঔরঙ্গজেব ও দারার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দারা পরাজিত হইয়া আগ্রায় পলায়ন করেন। ঔরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করিয়া সম্রাট শাহজাহানকে বন্দী করিলেন। ১৬৬৬ খৃঃ শাহজাহানের মৃত্যু হয়। তৃতীয় পুত্র মুরাদ ঔরঙ্গজেবের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে দারার পুত্র সুলেমানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। দারার পরিণাম হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। ঔরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে বিতাড়িত হইয়া দারা আজমীরে উপনীত হন। সেখানে ঔরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সেনাপতি বাহাদুর খাঁ কর্তৃক ধৃত হন। তাঁহাকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। চূড়ান্ত অপমান করিবার পর তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়।



শাহজাহান

ঔরঙ্গজেবের সাফল্য

ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে শাহজাহানের চরিত্র ও জাঁকজমকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে নৃশংস, বিলাসপরায়ণ ও ব্যাভিচারী সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিলেও তাঁহার মধ্যে বহুবিধ গুণাবলীর

সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান, তিনি তীর্থ-যাত্রীদের উপর কর ধার্য করেন। পত্নী মমতাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধির উপর বিশ্ব বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ তাজমহল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালকে ঐতিহাসিকগণ মুঘল শাসনকালের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সহিত বাণিজ্যের সূচনা হয়। ফলে চরম আর্থিক উন্নতি হয়। এই যুগে মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল। আগ্রার মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, ময়ূর সিংহাসন, জাম-ই মসজিদ ও তাজমহল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্যের অন্যতম। কিন্তু ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে সাধারণ মানুষের দুর্দশার উল্লেখ পাওয়া যায়। একাধিক সামরিক অভিযান ও কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে শিল্পকার্যগুলি নির্মাণ করাইবার ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সংকটের সম্মুখীন হইতেছিল। জনসাধারণের জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল।

শাহজাহানের কৃতিত্ব

ঔরঙ্গজেব আলমগীর ১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ (Aurangzeb Alamgir) ঃ উত্তরাধিকারের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। বাংলা দেশের শাসনকর্তা মীরজুমলা অহোম্ শক্তি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া ঢাকা হইতে আসামে প্রবেশ করেন। অহোম্‌রাজ জয়ধ্বজ সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন এবং বার্ষিক করপ্রদানে স্বীকৃত হন। ১৬৬৩ খৃঃ মীরজুমলা ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই অহোম্‌গণ তাহাদের হস্তচ্যুত স্থানগুলি পুনরায় অধিকার করে। কুচবিহারও মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়। অবশ্য কুচবিহাররাজ রংপুর ও পশ্চিম কামরূপ মুঘলদের ছাড়িয়া দেন। মীরজুমলার পর বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খান পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করেন এবং সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৬৬৭ খৃঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউসুফজাই উপজাতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু সেনাপতি মহম্মদ আমিন ইহাদের দমন করেন। ১৬৭২ খৃঃ আফ্রিদিগণ আকমল খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মুঘল সৈন্য বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ১৬৭৪ খৃঃ মুঘল সেনাপতি সুজাত খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর ঔরঙ্গজেব নিজে সসৈন্যে পেশোয়ারে উপনীত হন এবং কূটনীতির দ্বারা

সাম্রাজ্য বিস্তার

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

অধিকাংশ আফগান উপজাতিগুলিকে বশীভূত করেন। উপজাতি সর্দারদের অনেককে ভাতা, জায়গীর প্রভৃতি প্রদান করেন এবং অন্যদের বলপ্রয়োগে ধ্বংস করেন। কিন্তু সীমান্তে মুঘল সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর অভ্যুদয়ের পথ সুগম হইয়াছিল।

ধর্মনীতি (Religious Policy) ঃ ঔরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। ভারতকে একটি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি পবিত্র নৈতিক জীবন যাপন করিতেন। সাম্রাজ্যে মদ্যপান ও মদ্য প্রস্তুত নিষিদ্ধ করেন। নর্তকী ও গণিকাদের বিবাহ করিবার নির্দেশ দেন। তিনি হিন্দু বিরোধী নীতি অনুসরণ করেন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করেন। তিনি হিন্দু মন্দির ও বিদ্যালয় ধ্বংস করিবার নির্দেশ দেন এবং জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। হিন্দুদের অনেক ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেন। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁহাকে ভারত ব্যাপী একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

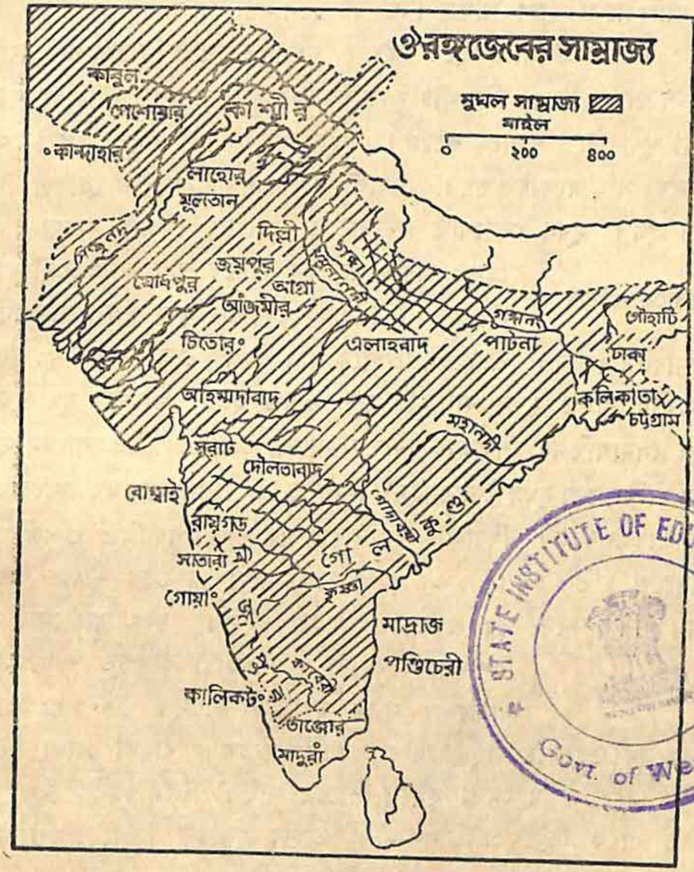
ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামী

হিন্দুবিরোধী নীতি

বিভিন্ন বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঃ ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা একাধিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মথুরা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জাঠগণ বারংবার বিদ্রোহী হয়। মুঘল সৈন্যবাহিনী কঠোর ভাবে ইহাদের দমন করে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইহাদের দমন করা সম্ভব হয় নাই। বুন্দেলখণ্ডের রাজপুতগণ এবং পাতিয়ালা ও আলোয়ারের সতনামীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু ইহাদের নির্মমভাবে দমন করা হয়। জাহাঙ্গীর শিখগুরু অর্জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করায় শিখগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের সময় শিখগুরু তেগ বাহাদুর সম্রাটের হিন্দুবিরোধী নীতির প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিরশ্ছেদ করা হয়। বিক্ষুব্ধ শিখগণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। মুঘল সাম্রাজ্য শিখ সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইল। ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতির ফলে তাঁহাকে দীর্ঘস্থায়ী রাজপুত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ১৬৭৮ খৃঃসেনাপতি যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মাড়োয়ার রাজ্যকে প্রত্যক্ষ মুঘল শাসনাধীনে আনয়ন করা হয়। যশোবন্ত সিংহের আত্মীয় ইন্দ্রসিংহ রাঠোর নামেমাত্র রাণা রহিলেন। এই সময় যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী যমজ পুত্রসন্তান প্রসব করেন। একটি পুত্রের সঙ্গে

জাঠ, বুন্দেলা ও সতনামী বিদ্রোহ

সঙ্গেই মৃত্যু হয় কিন্তু অপর পুত্র অজিত সিংহকে লইয়া তাঁহার পিতার অনুগামী-গণ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে মাড়োয়ারের সিংহাসনে বসাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব করিলে রাজপুতগণ ঘৃণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। মুঘল সৈন্য বাহিনীর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাজপুতগণ যোধপুরে



ফিরিয়া আসে। অতঃপর মুঘল সৈন্যবাহিনী যোধপুর অধিকার করিয়া ধ্বংস করিল। অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের শিশোদীয়া রাজকন্যা। মেবারের রাণা রাজসিংহ মাড়োয়ারের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। মেবারের সহিত মুঘল সৈন্য বাহিনীর সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। যুবরাজ আকবর অকস্মাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করায় মুঘল বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। অবশ্য আকবর শেষ পর্যন্ত মারাঠারাজ শম্ভুজীর নিকট পলায়ন করেন। সেখান

হইতে পারস্যে চলিয়া যান। অবশেষে ১৬৮১ খৃঃ মেবারের সহিত সম্রাটের সন্ধি হয়। জিজিয়া কর প্রদানের পরিবর্তে রাণা কয়েকটি জেলা মুঘল সম্রাটকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব সারাজীবন ব্যাপী মাড়োয়ারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রথম বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে মাড়োয়ারের রাণা স্বীকার করিয়া লন।

রাজপুত যুদ্ধ

দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তির বিস্তারের ফলে সম্রাটকে মারাঠা নেতা শিবাজীর সহিত সংঘর্ষে উপনীত হইতে হইল। মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিলেও শিবাজীর আকস্মিক নৈশ অভিযানে পরাজিত ও আহত হইয়া পুণা হইতে পলায়ন করেন। ইহার পর শিবাজী ও মুঘল সম্রাটের মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। শিবাজী অধিকাংশ দুর্গ মুঘলদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। মুঘল সেনাপতি জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী আগ্রায় গমন করেন। কিন্তু সম্রাটের নির্দেশে তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। শিবাজী কৌশলে মুক্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে রাজা উপাধি দেন। ১৬৭০ খৃঃ পুনরায় শিবাজীর সহিত মুঘল বাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অবিরাম যুদ্ধ করিয়াও মুঘল সেনাপতিগণ শিবাজীর বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুঘল সৈন্যবাহিনী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করে। শিবাজীর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী পরাজিত ও বন্দী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৬৮৯ খৃঃ ঔরঙ্গজেব সাফল্যের চরম সীমায় উপনীত হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পতনেরও সূচনা হইল। বৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দিল। দীর্ঘস্থায়ী রাজপুত ও মারাঠা যুদ্ধ সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিল। ১৭০৭ খৃঃ ৩রা মার্চ ঔরঙ্গজেব ভগ্নহৃদয়ে আহম্মদনগরে দেহত্যাগ করেন। সাহসী যোদ্ধা হইলেও তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা হইতে পারেন নাই। তিনি কূটনীতিবিদ ছিলেন কিন্তু সার্থক রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না। তাঁহার দূরদৃষ্টির অভাবের ফলে তাঁহার জীবদ্দশাতেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন সুরু হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে অভিযান

ব্যর্থতা

ঔরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ (Weak Successors of Aurangzeb) ঃ ঔরঙ্গজেব মৃত্যুর পূর্বেই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতংকিত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। আজম ও কামবকস্‌কে পরাজিত করিয়া শাহ আলম বাহাদুর

শাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়। জাহান্দার শাহ তিন ভ্রাতাকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১৭১২-১৩ খৃঃ)। জাহান্দার শাহের মৃত্যু হইলে ফরুকসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭১৩-১৯ খৃঃ)।

সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন

তাঁহার পর যথাক্রমে রফি-উদ-দরাজাত, রফি-উদ-দৌল্লা, মুহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বাংলাদেশে আলিবর্দি খাঁ, হায়দ্রাবাদে নিজাম, রোহিলাখণ্ডে আফগানগণ এবং অযোধ্যায় সাদাত খাঁ, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। মুহম্মদ শাহের পর আহম্মদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর, দ্বিতীয় শাহ আলম এবং দ্বিতীয় আকবর ১৮৩৭ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারা নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সহিত যোগাযোগের অপরাধে ইংরেজগণ কর্তৃক রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। ফলে মুঘল বংশের অবসান হয়।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Mughal Empire)ঃ একাধিক কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল। প্রথমতঃ, মুঘল সম্রাটগণ সামরিক শক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ফলে সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় বহন করিতে গিয়া উন্নয়নমূলক কার্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র। সম্রাটের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিত। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার ফলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যের বিশালতা ইহার পতনের একটি কারণ। চতুর্থতঃ, ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল। হিন্দু ও রাজপুতগণের বিরোধিতা সাম্রাজ্যের সর্বনাশ করিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, নৌবাহিনীর অভাবও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। ষষ্ঠতঃ, আমীর ওমরাহগণের মধ্যে দলাদলি ও নৈতিক অবনতি সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করিয়াছিল। সপ্তমতঃ, ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যনীতি সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। অষ্টমতঃ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিলাস-ব্যসন, জাঁকজমক ও নানাবিধ দুর্নীতি প্রবেশ করায় সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নবমতঃ, নাদিরশাহ ও আহম্মদশাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব

(Impact of Islam on Indian Culture)

ইসলামের প্রভাবঃ সংস্কৃতির সমন্বয় (Impact of Islam : Synthesis in Culture) : যুগে যুগে পারসিক, শক, হুণ, গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী জাতি দুর্বার গতিতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি এই সকল শক্তিশালী জাতিগণকে বারংবার ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল জাতি কালক্রমে ভারতীয় জনগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। কারণ ভারতে প্রবেশের পূর্ব হইতেই ইসলামী সভ্যতার একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল যাহার সহিত ভারতীয় সভ্যতার মূলগত প্রভেদ ছিল। বিজয়ী মুসলমানগণের নির্মম অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা ভারতীয়গণের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। মুসলমানগণ অমুসলমানদের 'জিম্মি' বলিত এবং ভারতীয়গণ মুসলমানদের 'যবন' এবং 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া অভিহিত করিত। উভয় সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার চেষ্টা করিল। ইসলামের প্রভাব হইতে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইল। হিন্দুসমাজ অধিকতর রক্ষণশীল হইয়া পড়িল। রঘুনন্দন শিরোমণি বাংলার রক্ষণশীল সমাজের নেতৃপদে আসীন হইলেন। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার মিলনের পথে দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি হইল।

হিন্দু ও ইসলামী সভ্যতার সংঘাত

কিন্তু দুইটি সভ্যতা যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতে বাধ্য। দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকিবার ফলে উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহনশীল মনোভাবের সৃষ্টি হইল এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। উভয় সভ্যতা ক্রমে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইল। উপনিষদের একেশ্বরবাদ এবং ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিবার ফলে উভয় সমাজ পরস্পরের প্রতি আগ্রহান্বিত হইল। সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিল। হিন্দুগণ আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া সুলতান ও

ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়

সম্রাটগণের দরবারে চাকুরী গ্রহণ করিল। হিন্দুরা মুসলমানদের পোযাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইল। ইহার ফলে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার উদ্ভব হইল এবং উভয় সমাজে উদার মনোভাবের সৃষ্টি হইল। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হইল। মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ এবং সুলতান ও সম্রাটগণ হিন্দুদর্শন বিশেষভাবে বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ মহাভারত, গীতা প্রভৃতি বাংলায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র নস্রত শাহ এবং সেনাপতি পরাগল খাঁও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ এবং কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিনও উদারচেতা সুলতান ছিলেন। জয়নাল আবেদিন হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর তুলিয়া দেন।

সুলতানি যুগে ঐক্যের সূচনা

মুঘল যুগে সংস্কৃতির এই সমন্বয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। শেরশাহ ছিলেন উদারচেতা শাসক। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তিনি বৈষম্য করেন নাই। বহু উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। আকবর ছিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি হিন্দুদের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। রাজা টোডরমল, মানসিংহ প্রভৃতি রাজপুত নেতাগণকে মনসবদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে রাজপুত রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং রাজপুতদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া রাজপুতানায় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল। পরবর্তী কালে দারাসুকো এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুপণ্ডিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। দারাসুকো ঔরঙ্গজেবের হস্তে পরাজিত ও নিহত হওয়ায় এই ঐক্যের স্রোত সাময়িকভাবে রুদ্ধ হইয়া যায়।

মুঘল যুগে ঐক্য প্রচেষ্টা

ধর্ম (Religion) : হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সংস্পর্শের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে উদার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের ধর্ম সংস্কারক ও দার্শনিক শংকরাচার্যের রচনার মধ্যে ভক্তিবাদের বীজ নিহিত ছিল। ইসলামের সুফীবাদের ন্যায় ভক্তিবাদও ছিল উদার মতবাদ। সুফীবাদ ভক্তিবাদ উভয় মতবাদই প্রেমের বাণী প্রচার করিল। ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতা এবং ইসলাম ধর্মের সাম্যের বাণী ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইল। ইসলামের আক্রমণের হাত হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য ধর্মানুষ্ঠানে সরলতা এবং জাতিভেদ প্রথার

ভক্তিবাদের উদ্ভব

কঠোরতা শিথিল করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। ইসলামের সুফীবাদও এক শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং মৈনুদ্দিন চিস্‌তির মত সুফী ধর্মজ্ঞানীগণও হিন্দু জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভক্তিবাদ প্রচারকদের মধ্যে রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্যদেব এবং নামদেব ও মীরাবাঈয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রামানুজ ও রামানন্দ জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। কবীর জাতিভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আল্লাহ এক। যিনি রাম তিনিই রহিম। মধ্যযুগে ধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাস্তব চেষ্টা করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূল কথা হইল বৈরাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম। তাঁহার মতে ভক্তি ও প্রেমের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। তিনি জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাস করিতেন না এবং ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর আধিপত্যের বিরোধী ছিলেন। নামদেব ছিলেন দরজী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি মূর্তি প্রতিষ্ঠা বা ধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোক ছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় নানকের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম শিখ ধর্ম নামে পরিচিত। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বহু মুসলমান ছিল। তিনি সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার বাণী প্রচার করেন। তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান পছন্দ করিতেন না। কথিত আছে তিনি মক্কা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন।

রামানুজ, রামানন্দ

কবীর

নামদেব

নানক

সাহিত্য (Literature)ঃ ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের ফল সাহিত্যেও লক্ষণীয়। ফার্সী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি আমীর খসরু মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি বলবন, আলাউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। কবি হাসান দেহল্‌ভি ও মিনহাজ-উস্‌-সিরাজ ফার্সী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিকগণ সংস্কৃতকে অবজ্ঞা করেন নাই। এবং মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও হিন্দুদের সাহিত্য প্রতিভা ও ভাষাজ্ঞান একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই।

সুলতানি যুগ

মুসলমান পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। হিন্দুগণও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া সুলতানদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যিকদের মধ্যে পার্থসারথী মিশ্র, রঘুনন্দন, বাচস্পতি মিশ্র, দেবস্থরী, জীব গোস্বামী ও মাধব বিদ্যারত্নের নাম উল্লেখযোগ্য। ফিরোজ তুঘলক ও সিকন্দর লোদীর আদেশে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। ধর্ম সংস্কারকগণ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সহজবোধ্য প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং বৈষ্ণব লেখকদের রচনার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচনা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। ইহারা মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। এই যুগে হিন্দী সাহিত্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলিম সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি

মুঘলযুগেও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় ফার্সী, হিন্দী এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বাবরের আত্মজীবনী একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। হুমায়ুনের দরবারে বহু সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। আকবরের সময়ে আবুল ফজল, নিজামউদ্দিন এবং বদায়ুনী রচিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য। বিখ্যাত গ্রন্থকার আবতুল হামিদ লাহোরী এবং ইনায়েৎ খাঁ সম্রাট শাহজাহানের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসুকো উপনিষদ ও ও ভাগবত গীতা ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আকবরের সময় কয়েকজন সুপণ্ডিত মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায় ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইগুলি একত্র করিয়া 'রাজম নামা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বদায়ুনী রামায়ণ ফার্সীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। হাজী ইব্রাহিম সিরহিন্দ অথর্ববেদ ফার্সীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মুঘল যুগে সাহিত্যের উন্নতি

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীকে হিন্দুস্থানী সাহিত্যের গৌরবময় যুগ বলা হয়। আকবরের রাজত্বকালে হিন্দী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। আকবরের সভাসদ এবং বন্ধু বীরবল একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের পূর্বে মালিক মহম্মদ জয়সী পদ্মিনীর উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া

'পদ্মভাত' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ রচিত বহু হিন্দী কবিতা এবং আকবরের মন্ত্রী আবদুর রহিম খানের রচিত দোহাগুলি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আকবরের সভায় হিন্দী কবিদের মধ্যে নরহরি, হরিনাথ এবং গঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় রাম ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া বহু হিন্দীগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল সাহিত্যিকদের মধ্যে সুরদাস, কুম্ভনদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'রামচরিতমানস' তুলসীদাসের বিরাট সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন। ইহা হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

হিন্দী সাহিত্য

মুঘল যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত রচনা' করেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল', ত্রিলোচনদাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' এবং নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তি রত্নাকর' বৈষ্ণব সাহিত্যের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতও বাংলায় অনুদিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' এই সময় রচিত।

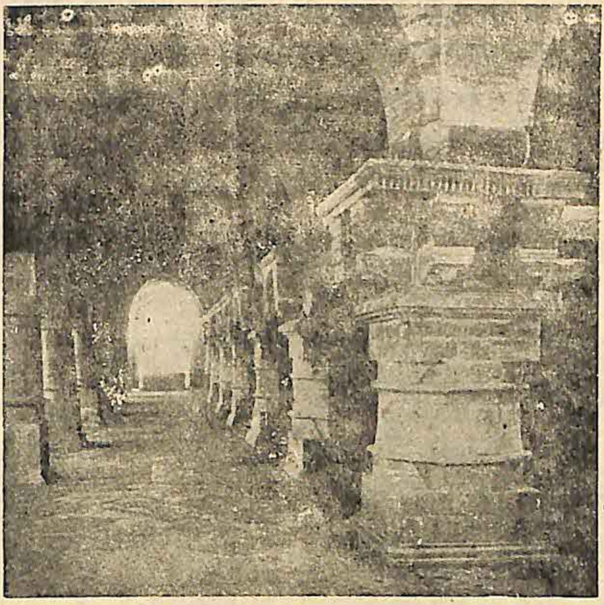
বৈষ্ণব সাহিত্য

শিল্প (Art) ঃ মধ্যযুগের শিল্পে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মিলিত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই মিশ্রশিল্পে কোন সভ্যতার অবদান কতটুকু তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। কারণ মুসলমান শিল্প ও সাহিত্য বহু শিল্পের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল। মুসলমানগণ যখন যে দেশ অধিকার করিয়াছে তখনই সেই দেশের শিল্পরীতিকে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াছে। সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পে হিন্দুরীতির সংমিশ্রণের ফলে হিন্দু-মুসলিম মিলিত ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১১৯৩ খৃঃ কুতুবউদ্দিন যে কুতুবমিনার নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা প্রথমে ছিল হিন্দু শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত। পরে কিছু মুসলিম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কুতুবউদ্দিন ও ইলতুৎমিসের সময় নির্মিত কুতুবমিনার সম্পূর্ণভাবে মুসলিম স্থাপত্য প্রতিভার নিদর্শন। আলাউদ্দিনের সময় বিখ্যাত আলাই দরওয়াজা নির্মিত হয়। তুঘলকবংশীয় সুলতানদের সময় বহু শিল্পকার্য নির্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আদিলাবাদের দুর্গ, জাহানাপনা সহর এবং ফিরোজাবাদের প্রাসাদদুর্গ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ ও লোদী সুলতানদের সময় কোন বিরাট শিল্পকার্য গড়িয়া উঠে নাই। তবুও এযুগের শিল্প

হিন্দু-মুসলিম মিলিত শিল্পরীতি

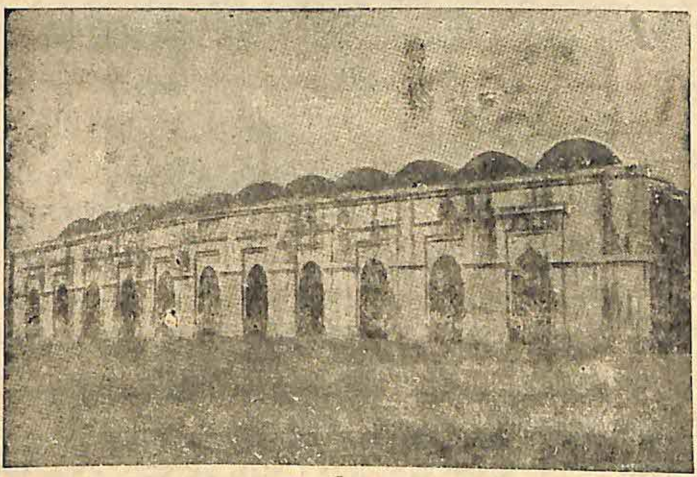
বিভিন্ন স্থানের শিল্প নিদর্শন

হিন্দু শিল্পরীতি ও প্রতিভার প্রয়োগে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লীর



আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া

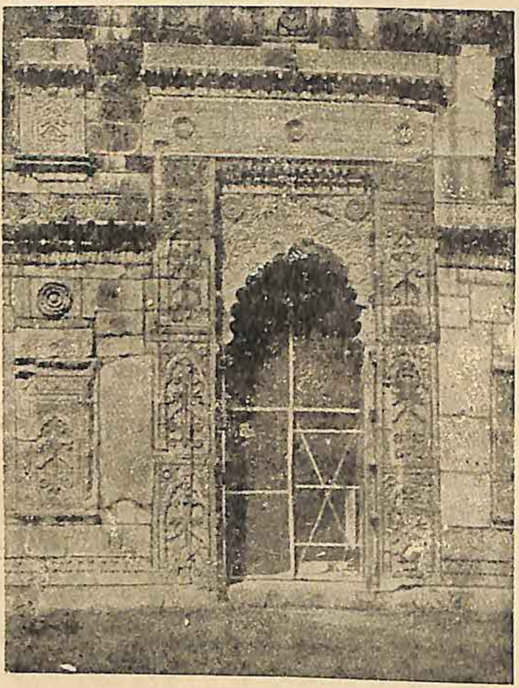
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশে বহু শিল্প-নিদর্শন পাওয়া যায়।



বড় সোনা মসজিদ, গৌড়

বাংলাদেশে সিকন্দর শাহ নির্মিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ পৃথিবীর বৃহত্তম

মসজিদগুলির অন্যতম। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা আর একটি আশ্চর্য শিল্প-সৃষ্টি। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ এবং আদিনা মসজিদ এই প্রদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন। বাংলা অপেক্ষা গুজরাটের শিল্পরীতি অনেক বেশী উন্নত ছিল। গুজরাটের শিল্পকার্যে হিন্দু প্রভাব অধিক কিন্তু মালবে মুসলমান শিল্পরীতির প্রভাব ছিল অধিক। মাণ্ডুর দুর্গ এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। জামী মসজিদ এবং হিন্দোলা মহল অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি। জৌনপুরের



ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়

অতালা মসজিদ একটি উন্নত শিল্প নিদর্শন। দক্ষিণ-ভারতের বহমনী সুলতান-গণও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে নির্মিত শিল্পে ভারতীয়, মিশরীয়, তুর্কী ও পারসিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুলতানগণের ন্যায় স্বাধীন হিন্দুরাজগণও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। রাণা কুম্ভ কর্তৃক নির্মিত বিজয়-স্তম্ভ এবং বিজয়নগরের হাজার মন্দির ও বিঠল স্বামীর মন্দির হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন।

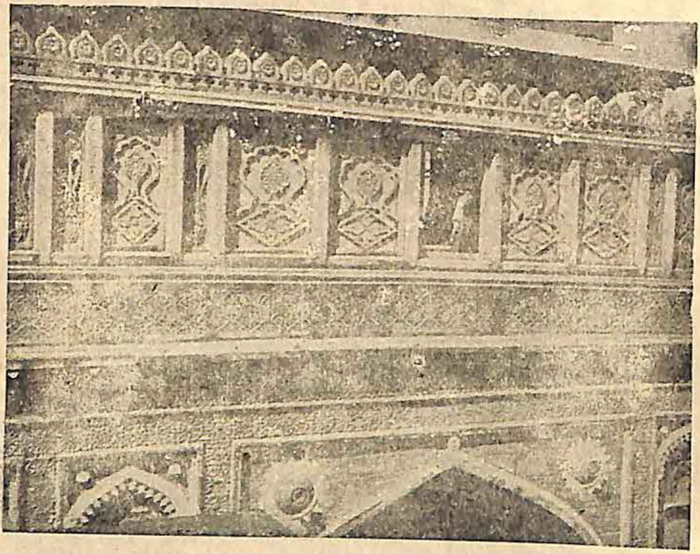
সুলতানী যুগের শিল্পসৃষ্টির ধারা মুঘল যুগেও অব্যাহত ছিল। মুঘল যুগে নির্মিত যে সকল স্থাপত্য নিদর্শন আজও রহিয়াছে হ্যাভেলের মতে তাহা ভারতীয় প্রতিভারই সৃষ্টি। জন মার্শালের মতে ভারতীয় শিল্প বিশেষ কোন রীতি অনুযায়ী গড়িয়া ওঠে নাই। আকবরের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প পারসিক নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আকবরের পর



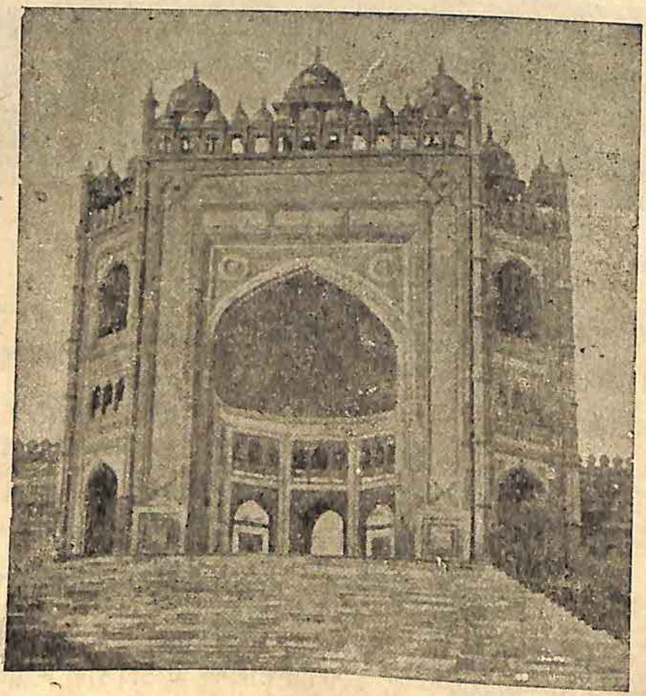
শেরশাহের সমাধি, সাসারাম

হইতে পারসিক প্রভাব বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং ভারতীয় শিল্প ভারতীয় প্রভাব অনুযায়ী গড়িয়া উঠে। ঔরঙ্গজেব ব্যতীত সকল মুঘল সম্রাটগণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবর নানাবিধ শিল্পকার্য নির্মাণের জন্য বহুসংখ্যক শিল্পী নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাবর ও হুমায়ুনের সময় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের বেশী প্রসার হয় নাই। কারণ তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। শেরশাহের সময় নির্মিত শিল্প নিদর্শন-গুলির মধ্যে "কিল্লা-ই-খুনা' মজসিদ এবং সাসারামে তাঁহার সমাধি উল্লেখযোগ্য। আকবরের রাজত্বকালে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। আকবরের সময়ে নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি পারসিক ও ভারতীয় শিল্পের সমন্বয়ে নির্মিত। আকবরের সময় নির্মিত শিল্পকার্যগুলির মধ্যে বুলান্দ দরওয়াজা,

মুঘল যুগের শিল্প

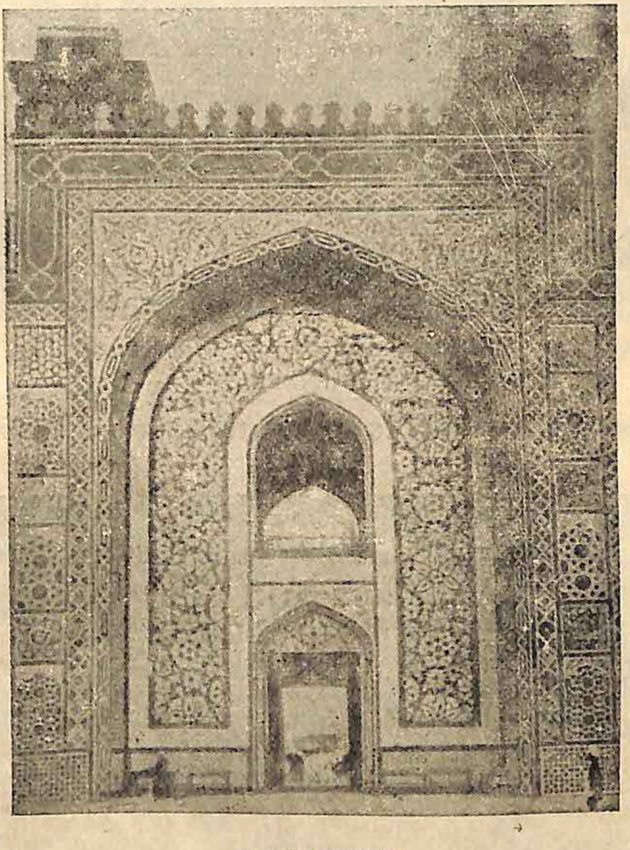


জাহাঙ্গীরী মহল, আগ্রাদুর্গ



বুলান্দ দরওয়াজা

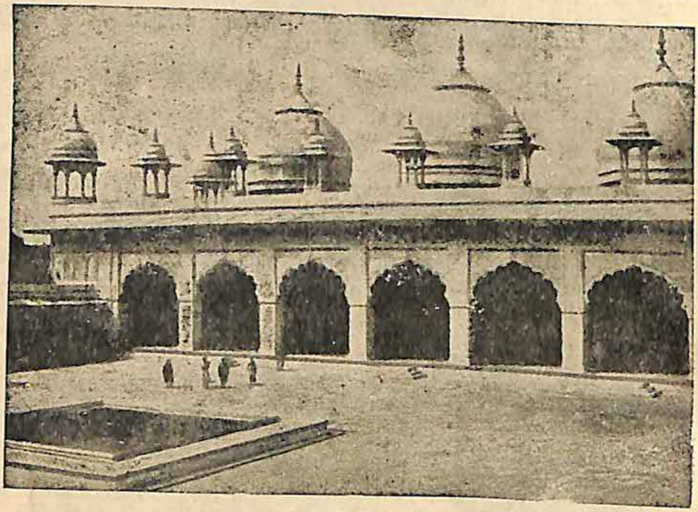
ফতেপুর সিক্রীর যোধবাঈএর প্রাসাদ, চল্লিশ স্তম্ভের প্রাসাদ প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। আকবরের সময় নির্মিত প্রাসাদ, মসজিদ এবং সমাধিতে ভারতীয় শিল্পরীতি সর্বাধিক প্রতিফলিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময় নির্মিত সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি একটি অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি। আগ্রায় নির্মিত ইতিমদ-উদ্-দ্দৌলার সমাধি সম্পূর্ণ শ্বেতমর্মরে নির্মিত এবং কারুকার্য-খচিত। ইহাতে রাজপুত শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।



সেকেন্দ্রার প্রবেশপথ

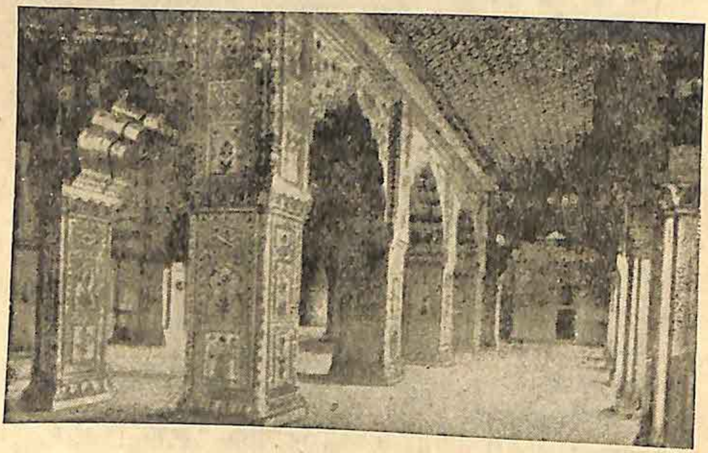
শাহজাহান স্থাপত্য শিল্পের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে আলংকারিক কারুকার্য এবং চিত্রাংকনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে তিনি বহু প্রাসাদ, দুর্গ, অট্টালিকা এবং মসজিদ নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন। তাঁহার সময়ে নির্মিত দিল্লীর 'দেওয়ান-ই-খাস', 'দেওয়ান-ই-আম',

আগ্রার 'মতি মসজিদ' এবং 'জামী মসজিদ' বিস্ময়কর শিল্প নিদর্শন। শাহজাহানের সময় নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন হইল তাজমহল। ইহাতে ইটালীয় ও ফরাসী



মতি মসজিদ, আগ্রা

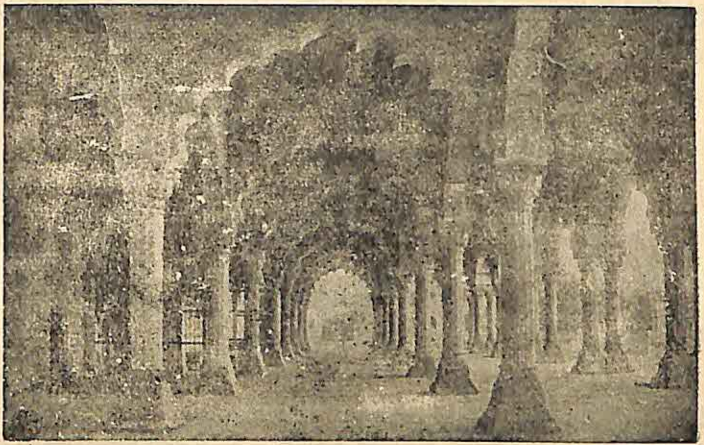
স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব রহিয়াছে। সম্রাট শাহজাহান বহুমূল্য ময়ূর সিংহাসন



দেওয়ান-ই-খাস, দিল্লী

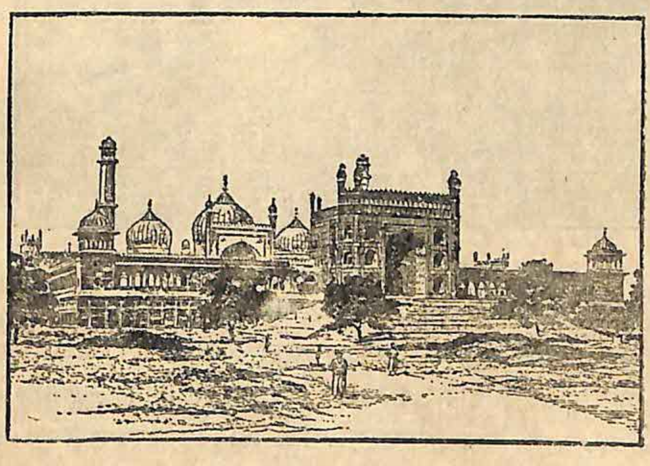
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নাদির শাহ ১৭৩৯ খৃঃ ইহা পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের সময় কেবলমাত্র লাহোরের মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

মুঘলযুগের চিত্রশিল্পে ভারতীয় এবং বৈদেশিক রীতির সমন্বয় হইয়াছিল। ভারতীয়, বৌদ্ধ, পারসিক, ব্যাকট্রিয় এবং মোঙ্গল রীতির সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট



দেওয়ান-ই আম, দিল্লী

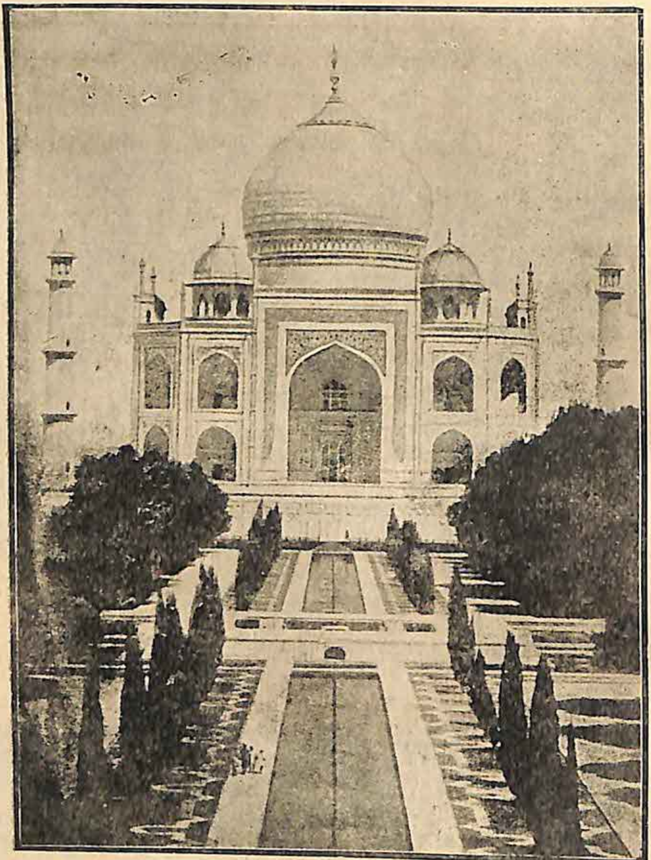
একপ্রকার চৈনিক শিল্প পদ্ধতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিত্রশিল্পকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আকবরের সময়ে নির্মিত চিত্রশিল্পে এই রীতির সুস্পষ্ট প্রভাব



জামী মস্‌জিদ

ছিল। বাবর চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুমায়ুন পারসিক চিত্রশিল্পীদের কাবুলের দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারা তানসেনের মুঘল দরবারে প্রবেশের যে চিত্র অংকন করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দু ও পারসিক

শিল্পরীতির সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। আকবরের সময়ে ফতেপুরে সিক্রীর দেওয়াল গাত্রে অংকিত চিত্রগুলি হিন্দু ও পারসিক রীতি অনুযায়ী অংকিত



তাজমহল, আগ্রা

হইয়াছিল। আকবরের দরবারে সতের জন প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীর মধ্যে তেরো জনই ছিলেন হিন্দু। আকবরের সময়ে চিত্রশিল্পের যে উন্নতি হইয়াছিল জাহাঙ্গীরের সময়েও তাহা অম্লান ছিল। জাহাঙ্গীর চিত্রশিল্পের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের সময় চিত্রশিল্পের অবনতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুতনায় এবং বিশেষভাবে জয়পুরে এক সুন্দর চিত্রশিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে কাংরা এবং তেহরী গাড়োয়ালে যে শিল্প পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পাহাড়ী চিত্রশিল্পের অনবদ্য নিদর্শন।

চিত্রশিল্প,
হিন্দু ও পারসিক শিল্পরীতি
পাহাড়ী চিত্রশিল্প

সমাজ জীবন (**Social Life**) : সুলতানি যুগে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। সুলতানগণের বহু সংখ্যক পুরুষ ও নারী ক্রীতদাস থাকিত। আলাউদ্দিনের পঞ্চাশ হাজার এবং ফিরোজ তুঘলকের দুইলক্ষ ক্রীতদাস ছিল। সুলতানগণ ক্রীতদাসদের সহিত সাধারণতঃ খারাপ ব্যবহার করিতেন না। বুদ্ধিমান এবং অনুগত ক্রীতদাসদের অনেককে সুলতানগণ মুক্ত করিতেন এবং তাহারা অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক খ্যাতিলাভ করিত। ক্রীতদাস প্রচলিত থাকিবার ফলে সুলতানদের অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে সমাজজীবনের একটি দুষ্টক্ষত ছিল। সমাজের সর্বাগ্রে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাহার পরই ছিল অভিজাত শ্রেণী। সর্বনিম্নে ছিল কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে স্ত্রীলোকেরা পরিবারের কর্তার অধীন ছিল। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ অন্তঃপুরেই থাকিত। ভারতের প্রায় সর্বত্র পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্যেই ব্যাপৃত থাকিত। উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ অনেকসময় শিক্ষালাভের সুযোগ পাইত। এই যুগের বিদুষী মহিলাদের মধ্যে রূপমতী ও পদ্মাবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আকবর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমাজ জীবনের মান উন্নত ছিল কিন্তু অভিজাত ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ মদ্যপায়ী ও ব্যাভিচারী ছিলেন।

ক্রীতদাস প্রথা

নারীর অবস্থা

মুঘল যুগে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট। তাঁহার পরেই অভিজাত শ্রেণী। ইহারা চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী এবং উচ্ছৃংখল ছিলেন। ইহাদের হারেমে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক থাকিত। মুঘলযুগে প্রথম দিকে অভিজাতরা কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময়ে তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়ে ও দলাদলিতে লিপ্ত হয়। ইহাদের নীচে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, দোকানদার প্রভৃতি। ইহারা বিত্তশালী হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। সাধারণ শ্রেণীর অবস্থা মোটেই উন্নত ছিল না। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ছিল সামান্য। অল্প বেতনে মজুরী খাটিয়া ইহারা জীবিকা অর্জন করিত। ইহারা ছোট ছোট ঘরে বাস করিত এবং কোন প্রকারে দু'মুটি অন্নসংস্থান করিত। নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ উচ্ছৃংখল বা ব্যাভিচারী ছিল না। জীবিকা অর্জনের জন্য তাহাদের কঠোর শ্রম করিতে হইত। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, পণপ্রথা,

মুঘলযুগে সমাজ, সাধারণ শ্রেণীর দুরবস্থা

হিন্দুদের সামাজিক প্রথা

বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা প্রচলিত ছিল। বিবাহিতা মহিলাগণ স্বামীর অধীনে থাকিতেন। সমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে সামাজিক কুসংস্কার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

অর্থনৈতিক জীবন (Economic Life) ঃ স্থলতানি যুগে অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল গ্রাম্য। কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। করভারে ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচরে জনসাধারণ নিপীড়িত হইত। একদিকে ছিল স্থলতান ও অভিজাত শ্রেণীর জাঁকজমক ও বিলাস ব্যসন এবং অন্যদিকে ছিল সাধারণ মানুষের অন্তহীন দারিদ্র। ফসল ভাল না হইলে কৃষকদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। ভারতে কাপড়, কাগজ, চিনি ও গন্ধদ্রব্য প্রচুর উৎপন্ন হইত। রেশম ও পশমের বস্ত্রও যথেষ্ট উৎপন্ন হইত। বিদেশী ভ্রমণকারীগণ বাংলার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য বাংলা ও গুজরাটের খ্যাতি ছিল। বস্ত্র, নীল, আফিং, প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হইত। জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল।

স্থলতানি যুগ, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি

মুঘলযুগের সূচনায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল। আকবরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণের সময় পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের বিবরণ ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণী এবং সমসাময়িক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায়। মুঘলযুগে শহরগুলি ছিল সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী। মনসেরেট লাহোরকে ইউরোপ ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরগুলির সমতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, আহম্মদাবাদ, পাটনা, ঢাকা, হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী শহর ছিল। রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। নদীপথে বাণিজ্য প্রসারলাভ করিয়াছিল। কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। খাদ্যশস্য ব্যতীত ইক্ষু, নীল, তুলা, রেশম প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইত। বাংলা ও বিহারে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইত। মুঘলযুগে একাধিকবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই সময় সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ঢাকার মস্‌লিন ছিল জগৎ বিখ্যাত। বাংলাদেশ ছিল রেশম শিল্পের কেন্দ্র। ভারতীয় ও ইউরোপীয় বণিকগণ এখান হইতে রেশম বস্ত্র কিনিতেন। ভারতীয়গণ নানাবিধ শিল্পে

মুঘলযুগে অর্থনৈতিক অবস্থা

কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি

বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারতের বন্দরগুলির মধ্যে সুরাট, ব্রোচ, দাবল, গোয়া, কালিকট, কোচিন, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। জিনিষপত্রের মূল্য অত্যন্ত কম হইলেও জনসাধারণ উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত না, কারণ তাহাদের আয়ও ছিল খুব কম। ভারতের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা ইউরোপীয় বণিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মুঘল দরবারের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের ঐশ্বর্য্য মুষ্টিমেয় লোকের হস্তেই ছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। মোরল্যাণ্ড মন্তব্য করিয়াছেন "ভারতে ছিল অল্প সংখ্যক ধনী এবং অভিজাত শ্রেণী, অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত এবং অসংখ্য দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর লোক।"

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার

সাধারণ মানুষের দুর্দশা

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা ও শিখজাতি

(The Marathas and the Shikhs)

শিবাজী (Shivaji) ঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয় নগর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের ন্যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহারা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। বিচ্ছিন্ন মারাঠা শক্তিকে একত্রিত করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব শিবাজীর। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে আহম্মদনগরের স্থলতানের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। শাহজাহান আহম্মদনগর অধিকার করিলে তিনি বিজাপুরের স্থলতানের অধিনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পুনায় তাঁহার পুরানো জায়গীর থাকা সত্বেও তিনি কর্ণাটকে নূতন জায়গীর প্রাপ্ত হন।

১৬৩০ খৃঃ জুনারের নিকটে পর্বতদুর্গ শিবনারে শিবাজীর জন্ম হয় (অনেকের মতে ১৬২৭ খৃঃ)। শাহজী, শিবাজী ও তাহার মাতা জিজাবাঈকে পুনাতে দাদাজী কণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে রাখিয়া নিজে দ্বিতীয় পত্নী তুকাবাঈকে লইয়া তাঁহার নূতন জায়গীরে চলিয়া যান। মাতার নিকট হইতে বাল্যকালে মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী হইতে বীরত্বের গল্প শুনিয়া শিবাজীর মনে ধর্মভাব ও দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল। বাল্যকালে শিবাজী লেখাপড়া শিখিবার স্থযোগ পান নাই। পশ্চিমঘাট পর্বতের মাওয়ালী অঞ্চলের মাওয়ালীদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ইহারাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু দাদাজী কণ্ডদেব জীবিত থাকিতে তিনি এই দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। দাদাজী কণ্ডদেবের মৃত্যু হইলে শিবাজী রাজ্য জয়ে অগ্রসর হন।

বাল্যকাল

১৬৪৬ খৃঃ শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পর রায়গড়, কোনাদা এবং বিজাপুর রাজ্যের আরও কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। বিজাপুরের স্থলতান তাঁহার পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিলে তিনি কিছুদিন আক্রমণাত্মক কার্য বন্ধ রাখেন। পিতার মুক্তির পর তিনি ক্ষুদ্র মারাঠা

রাজ্য জাবালী অধিকার করেন এবং মুঘল অধিকৃত আহম্মদনগর ও জুনার লুণ্ঠন করেন। কিন্তু শিবাজী মুঘলদের হস্তে পরাজিত হন। বিজাপুরের সুলতান মুঘলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে তিনিও সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ঔরঙ্গজেব শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এই সুযোগে শিবাজী কল্যাণ ভিওয়ান্দি এবং মাহুলি অধিকার করিলেন।

বিজাপুরের সহিত সংঘর্ষ

শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বিজাপুরের সুলতান সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করেন (১৬৫৯ খৃঃ)। আফজল খাঁ শিবাজীকে হত্যার উদ্দেশ্যে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব পাঠাইয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া শিবাজী বাঘনখ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। উভয়ের মধ্যে আলিঙ্গনের সময় আফজল খাঁ শিবাজীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে শিবাজী বাঘনখ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করেন। শিবাজী বিজাপুর সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া তাহাদের শিবির লুণ্ঠন করেন।

শিবাজী ইহার পর কোলাপুর ও দক্ষিণ কংকন অধিকার করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সায়েস্তা খাঁকে প্রেরণ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ পুণা ও চকন অধিকার করিবার পর কল্যাণ হইতে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন। শিবাজী আপাততঃ বিজাপুরের সহিত শান্তি স্থাপন

মুঘলদের সহিত সংঘর্ষ

করিলেন। প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধের পর শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে সায়েস্তা খাঁ পরাজিত ও আহত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র ও চল্লিশজন দেহরক্ষী শিবাজীর হস্তে নিহত হইল। ১৬৬৪ খৃঃ শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করিলেন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে ধ্বংস করিবার জন্য জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে প্রেরণ করিলেন। মুঘলবাহিনী পুরন্দর ও রায়গড় অবরোধ করিলে শিবাজী পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে

পুরন্দরের সন্ধি

বাধ্য হইলেন। বারোটি দুর্গ নিজের অধিকারে রাখিয়া তেইশটি দুর্গ মুঘলদের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং দাক্ষিণাত্য অভিযানে মুঘল সৈন্যবাহিনীকে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। তিনি বিজাপুর রাজ্যের কয়েকটি জেলায় চৌথ ও সর্দেশমুখী আদায়ের অনুমতি পাইলেন। অতঃপর জয়সিংহের অনুরোধে সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত তিনি আগ্রায় উপনীত হইলে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁহাকে নজর বন্দী করিয়া রাখা হয়। কিন্তু শিবাজী কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহার পর শিবাজী তাঁহার রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে আত্মনিয়োগ করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে রাজা উপাধি দেন এবং মেবারে জায়গীর প্রদান করেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী ৫০০০ সৈন্যের মনসবদারের মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। ১৬৭০ খৃঃ শিবাজীর সহিত মুঘলদের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সন্ধি অনুযায়ী যে সকল দুর্গ মুঘলদের অর্পণ করা হইয়াছিল শিবাজী সেগুলি পুনরধিকার করিলেন এবং দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করিলেন। মুঘল সেনাপতি অবিরাম যুদ্ধ করিয়াও শিবাজীকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। শিবাজী ১৬৭৪ খৃঃ রায়গড় দুর্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করেন। ১৬৭৭ খৃঃ তিনি জিন্‌জি, ভেলোর এবং সন্নিহিত অঞ্চলগুলি অধিকার করেন। ১৬৮০ খৃঃ মাত্র তিপান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শিবাজীর রাজ্য রামনগর হইতে কারওয়ার এবং বাগলানা হইতে কোলাপুরপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ এবং পশ্চিম কর্ণাটক তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ



শিবাজী

শিবাজী একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রান্তগুলি কয়েকটি পরগণা বা তরফে বিভক্ত ছিল, সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসনবাবস্থায় শিবাজী হস্তক্ষেপ করিতেন না। গ্রামের শাসনকার্য পরিদর্শনের জন্য দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে নামে দুইজন কর্মচারী ছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য শিবাজী নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করেন। উৎপন্ন শস্যের শতকরা তেত্রিশ ভাগ এবং পরে চল্লিশভাগ রাজস্ব আদায় করা হইত। শস্যের পরিবর্তে অর্থদ্বারা রাজস্ব আদায় করা যাইত। শিবাজী তাঁহার রাজ্যের সন্নিহিত অঞ্চল, মুঘল অধিকৃত এলাকা এবং বিজাপুর রাজ্যের কয়েকটি জেলা হইতে যৌথ ও সর্দেশমুখী নামক দুই প্রকার কর আদায় করিতেন। শিবাজীর একটি স্থায়ী সৈন্যদল ছিল। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে প্রায় চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী ও দশহাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। অশ্বারোহী বাহিনী বর্গী ও শিলাদার এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। বর্গীগণ সরকার হইতে বেতন, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র পাইত। কিন্তু শিলাদারগণ

শাসন ব্যবস্থা

সৈন্যবাহিনী

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাইত। ইহার দ্বারা তাহারা নিজেদের এবং তাহারা যে সকল অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধের জন্য আনিত তাহাদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিত। শিবাজী একটি নৌবাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। সৈন্য-বাহিনীতে তিনি কঠোর নিয়ম শৃংখলা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে শিবাজী এক গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সামান্য জায়গীরদার হইতে তিনি ছত্রপতি হইয়াছিলেন। বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত মারাঠা জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মারাঠাজাতি ইংরেজ শাসনের সময়কাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। শিবাজী ব্যক্তিগত জীবণে পবিত্র ছিলেন। মাতা ও গুরু রামদাসের নিকট হইতে তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন জীবনে কোনদিন তাহা বিস্মৃত হন নাই। শিবাজী হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলমান ধর্মজ্ঞানী ও খৃষ্টান পাদ্রীদের তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সৈন্যদের ধর্মস্থান অপবিত্র না করিতে এবং স্ত্রীলোকদের কোন ক্ষতি না করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কোন কোরাণ তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি সযত্নে তাহা রাখিয়া দিতেন এবং পরে তাহা কোন মুসলমানের হস্তে অর্পণ করিতেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে এই ধরণের চরিত্রের দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

শিবাজীর পর মারাঠাশক্তি (Maratha power after Shivaji) ঃ শিবাজীর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মুঘল সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম পলাইয়া যান কিন্তু পুত্র শাহু মুঘল সৈন্যবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। শম্ভুজীর মৃত্যুর পর রাজারাম দুর্ভেদ্য জিন্‌জি দুর্গ হইতে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ১৭০০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজীর অভিভাবকরূপে তাঁহার বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ মারাঠাজাতিকে সংঘবদ্ধ করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মারাঠাজাতির মধ্যে গৃহবিবাদ স্বরু হইবে এই আশায় আজমশাহ, শাহুকে মুক্ত করিয়া দেন। শাহু সসৈন্যে সাতারায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তারাবাঈয়ের পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি শাসনক্ষমতা হারাইলেন। তখন রাজারামের অন্য পত্নী রাজসবাঈ তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়

রাজারাম ও তারাবাঈ

শাহু

শম্ভুজীকে কোলাপুরের সিংহাসনে বসাইয়া শাহুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বালাজী বিশ্বনাথ নামক একজন চিতপবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে শাহু মারাঠা রাজ্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন।

বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৩-২০ খৃঃ (Balaji Biswanath) ঃ কংকণের এক গরীব ব্রাহ্মণবংশে বালাজী বিশ্বনাথের জন্ম হয়। ১৭১৩ খৃঃ তিনি শাহু কর্তৃক পেশোয়া পদে নিযুক্ত হন। কালক্রমে তাঁহার কৃতিত্বের ফলে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী মারাঠারাজ্যের সত্যিকারের শাসকে পরিণত হইলে ছত্রপতি বা রাজা নামে মাত্র রাজা রহিলেন।

বালাজী পেশোয়া নিযুক্ত হইয়া মারাঠা রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনিলেন। দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তখন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। হুসেন আলি মারাঠা সাহায্য লাভের আশায় ১৭১৪ খৃঃ বালাজী বিশ্বনাথের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার সর্ত অনুযায়ী শিবাজী অধিকৃত এবং পরে মুঘলগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত দুর্গগুলি শাহুকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। গণ্ডোয়ানা, বেরার, খান্দেশ, কর্ণাটক এবং হায়দ্রাবাদের কয়েকটি জেলা শাহুকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মুঘল সুবা বা প্রদেশ হইতে শাহু চৌথ বা সর্দেশমুখী আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইহার বিনিময়ে শাহু মুঘল সম্রাটকে বার্ষিক দশলক্ষ টাকা কর প্রদান করিতে, ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে এবং দাক্ষিণাত্যে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে হুসেনআলি ফরুকশিয়ারকে পদচ্যুত করিয়া আর একজন অকর্মণ্যকে সিংহাসনে বসাইলেন। বালাজী দিল্লীতে উপনীত হইয়া স্বচক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন দেখিলেন এবং উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইলেন।

মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রথম বাজীরাও ১৭২০-৪০খৃঃ (Baji Rao) ঃ ১৭২০ খৃঃ বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া নিযুক্ত হইলেন। তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মারাঠা রাজনীতিবিদ। তাঁহার কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বিভিন্ন হিন্দু সামন্ত এবং নৃপতিগণের সমর্থনের আশায় তিনি হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর আদর্শ প্রচার করেন। ১৭২৩ খৃঃ তিনি মালব এবং তাহার পর গুজরাট অধিকার করেন। ১৭৩১

হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর আদর্শ

খৃঃ বিরোধী মারাঠা সেনাপতি ত্রিম্বক রাওকে পরাজিত ও নিহত করেন। তিনি নিজাম-উল-মূলকের সহিত শান্তি স্থাপন করেন এবং অম্বরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলারাজ ছত্রশালের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ১৭৩৬ খৃঃ তিনি সসৈন্যে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। নিজাম-উল-মূলক মুঘল সম্রাটের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। ভূপালের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া বাজীরাওএর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। মুঘল সম্রাট মালবের উপর মারাঠা অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন, চম্বল হইতে নর্মদা পর্যন্ত অঞ্চল মারাঠাদের ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন। উত্তর ভারতের একাংশের উপর মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৩৯ খৃঃ বাজীরাও পর্তুগীজদের নিকট হইতে সলসেট এবং বেসীন অধিকার করিলেন।

উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য

বালাজী বাজীরাও ১৭৪০-৬১ খৃঃ (Balaji Baji Rao)ঃ ১৭৪০ খৃঃ বাজী রাওয়ের মৃত্যুর পর বালাজী বাজীরাও বা দ্বিতীয় বালাজী পেশোয়া হন। ১৭৪৯ খৃঃ শাহু মৃত্যুর পূর্বে পেশোয়ার হস্তে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া যান এবং শিবাজীর বংশধরগণের মধ্য হইতে রাজা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়া যান। মারাঠা রাজা পেশোয়ার ক্রীড়নক হইয়া রহিলেন। বালাজী দুইটি মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি শিবাজীর মারাঠা জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের আদর্শ পরিত্যাগ করিলেন এবং বহু অমারাঠীকে সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করিলেন। ফলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ হ্রাস পাইল। দ্বিতীয়তঃ বালাজী হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর আদর্শ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ধ্বংস কার্যে লিপ্ত হইল। ফলে মুসলমান শক্তি ধ্বংস করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা কঠিন হইয়া পড়িল।

বালাজীর ত্রুটি

১৭৫৭ খৃঃ মারাঠা সৈন্যবাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট উপস্থিত হইল এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে সামন্ত রাজ্যগুলি হইতে বলপূর্বক কর আদায় করিল। ১৭৬০ খৃঃ মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইয়া নিজাম কয়েকটি অঞ্চল ও দুর্গ মারাঠাদের ছাড়িয়া দিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ মলহর রাও হোলকার এবং রঘুনাথ রাও উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ মারাঠা সৈন্যবাহিনী দিল্লী আক্রমণ করিয়া আহম্মদ শাহ আবদালীর প্রতিনিধি নাজিম-উদ-দ্দৌলাকে পরাজিত করিল কিন্তু মুঘল সম্রাটের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিল না। ১৭৫৮ খৃঃ

উত্তর ভারতে মারাঠাদের অগ্রগতি

মারাঠাগণ পাঞ্জাব অধিকার করিয়া আদিনা বেগ খাঁর হস্তে ইহার শাসনভার ন্যস্ত করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর শিবাজী সিন্ধিয়াকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৭৫৯ খৃঃ আহম্মদ শাহ আবদালী পুনরায় ভারত আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব পুনরধিকার করিলেন। মারাঠা অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত অযোধ্যার নবাব ও রোহিলাখণ্ডের শাসনকর্তা আবদালীর পক্ষে যোগদান করিলেন। আবদালী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বালাজী বাজীরাওয়ের নীতিতে রাজপুতগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা নিরপেক্ষ রহিল। আবদালী থানেশ্বরের যুদ্ধে দত্তজী সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিলেন। বরারিঘাটের যুদ্ধে দত্তজী নিহত হইলেন। উত্তর ভারতে মারাঠাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বালাজী, সদাশিব রাও ভাউ এবং পেশোয়ার পুত্র বিশ্বনাথ রাওয়ের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। ১৭৬০ খৃঃ মারাঠাবাহিনী দিল্লী অধিকার করিয়া পাণিপথের প্রান্তরে আবদালীর সম্মুখীন হইল। আবদালী অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিবার পর প্রায় ৬০,০০০ সৈন্য লইয়া পাণিপথের প্রান্তরে সমবেত হইয়াছিলেন। পাণিপথের ঐতিহাসিক প্রান্তরে আর একবার ভারতের ভাগ্যপরীক্ষা হইল। অপরিসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও মারাঠা সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল। বিশ্বনাথ রাও এবং সদাশিব রাও নিহত হইলেন। পাণিপথের প্রান্তরে মারাঠা সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইল। ভগ্নহৃদয়ে বালাজী বাজীরাও মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৬০ খৃঃ)। পেশোয়া পরবর্তী প্রথম মাধব রাও মারাঠা শক্তিকে পুনর্গঠিত করিতে সমর্থ হইলেও মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা চিরতরে বিলীন হইয়াছিল। মারাঠাদের বিপর্যয়ের ফলে পাঞ্জাবে শিখশক্তি ও মহীশূরে হায়দার আলির অভ্যুদয়ের পথ সুগম হইয়াছিল এবং ইংরেজরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিল।

আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৭৭০-৮১ খৃঃ (First Anglo Maratha war) : পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হইলেও মারাঠা শক্তি ধ্বংস হয় নাই। পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠাগণ হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। প্রথম মাধবরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ-রাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু নয়মাস পরে তিনি পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে নিহত হন। রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্নী একটি পুত্র সন্তান প্রসব

করেন। মারাঠা নায়কগণ এই শিশু পুত্রকে পেশোয়া পদে বসাইলে রঘুনাথ রাও পুণা হইতে পলায়ন করেন এবং ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। রঘুনাথ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যের বিনিময়ে সলসেট এবং বেসিন ইংরেজদের অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী সলসেট অধিকার করিল। পুণার মারাঠা কর্তৃপক্ষের সহিত বোম্বের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের যুদ্ধ সুরু হইল। ১৭৭৫ খৃঃ আরাসের যুদ্ধে ইংরেজদের হস্তে মারাঠা সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল সুরাটের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া পুণা কর্তৃপক্ষের পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করিল। কোম্পানী পেশোয়ার নিকট হইতে সলসেট পাইল। কিন্তু কোম্পানীর ইংলণ্ডের পরিচালকমণ্ডলী সুরাটের সন্ধি সমর্থন করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তেলিগাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইল এবং ওয়াদগাঁও'এ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করিল এবং ওয়াদগাঁওয়ের অপমানজনক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু হেষ্টিংস এই সন্ধি অগ্রাহ্য করিলেন। মাধোজী ভোঁসলে ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করিলেন এবং সেনাপতি গডার্ড ফতেসিং গাইকোয়াডের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার পর আহম্মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিলেন। সেনাপতি পপহাম সিন্ধিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়র অধিকার করিলেন এবং আর একদল ইংরেজ সৈন্য মালব অধিকার করিল। ভীত সিন্ধিয়া ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিলেন। অতঃপর মাহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সলবাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (১৭৮২ খৃঃ) ইংরেজগণ সলসেট পাইল কিন্তু অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলগুলি মারাঠাদের ফিরাইয়া দিল। রঘুনাথ রাওকে বৃত্তি প্রদান করিতে পেশোয়া স্বীকৃত হইলেন। সিন্ধিয়া নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূখণ্ড ফিরিয়া পাইলেন। ইংরেজরা মাধবরাও নারায়ণকে স্বীকার করিয়া লইল। হেষ্টিংস মারাঠা শক্তি ধ্বংস করিতে পারিলেন না। কিন্তু ২০ বৎসর ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি বজায় ছিল।

সুরাটের সন্ধি

পুরন্দরের সন্ধি

ওয়াদগাঁওয়ের সন্ধি

সলবাইয়ের সন্ধি

নানা ফড়নবিশ ও মাহাদজী সিন্ধিয়াঃ ১৭৭২ খৃঃ পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর হইতে নানাফড়নবিশ মারাঠা জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার কৃতিত্বের ফলে রঘুনাথ রাও ও ইংরেজদের চক্রান্ত

ব্যর্থ হয়। তাঁহার অসাধারণ কূটনৈতিক প্রতিভার জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে ভারতের মেকিয়াভেলী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৭৮৫ খৃঃ টিপু মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করিলে নিজামের সাহায্যে তিনি টিপুকে পরাজিত করিয়া কিট্টুর, নারগুদ ও বাদামী লাভ করেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে তিনি ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত এলাকা মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৫ খৃঃ তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠা নায়কগণ সংঘবদ্ধ হইয়া নিজামকে পরাজিত করে। নানার ক্ষমতা অসহ্য হওয়ায় পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও ১৭৯৬ খৃঃ আত্মহত্যা করেন। নানাফড়নবিশ ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করেন। ১৮০০ খৃঃ তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।



নানা ফড়নবিশ

মাহাদজী সিন্ধিয়া ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী মারাঠা নায়ক। তিনি তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৭১ খৃঃ তিনি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে সিংহাসনে বসান এবং প্রকৃত পক্ষে সম্রাটের অভিভাবকে পরিণত হন। তাঁহার মধ্যস্থতায় সলবাইয়ের সন্ধি দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। তিনি মুঘল সম্রাটের সেনাপতির পদ এবং দিল্লী ও আগ্রার শাসনভার প্রাপ্ত হন। উত্তর ভারতে শতদ্রু হইতে আগ্রা পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৭৯৪ খৃঃ তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মাহাদজী সিন্ধিয়া

নিজাম ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধঃ মারাঠাগণ নিজামের নিকট হইতে চৌথ ও সর্দেশমুখী বাবদ বহু অর্থ পাইত। ইহা লইয়া উভয়পক্ষের মধ্যে গুরুতর বিরোধ যুদ্ধে পরিণত হইল। মারাঠা নায়কগণ নিজামকে ধ্বংস করিবার জন্য সম্মিলিত হইলেন। স্যার জন শোরের নীতি অনুযায়ী ইংরেজরা নিরপেক্ষ রহিল। খরদার যুদ্ধে (১৭৯০ খৃঃ) পরাজিত হইয়া নিজাম সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। নিজাম তাঁহার রাজ্যের অর্ধেক মারাঠাদের ছাড়িয়া দিলেন, প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার উদ্ধত মন্ত্রীকে মারাঠাদের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

দ্বিতীয় বাজীরাও ও বেসিনের সন্ধি ঃ ১৮০০ খৃঃ নানাফড়নবিশের মৃত্যুর পর মারাঠাদের মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলা বিনষ্ট হইয়াছিল। মারাঠা নায়কদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। পুনায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লইয়া দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়। ১৮০২ খৃঃ যশোবন্ত রাও হোলকার পুণার অদূরে সিন্ধিয়া ও দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও পুণা হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে কংকন ও পরে বেসিনে উপনীত হইলেন। ঐ বৎসরই তিনি অধীনতা-মূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিয়া ইংরেজদের সহিত বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী ছয় হাজার ইংরেজ সৈন্য পেশোয়ার রাজ্যে নিযুক্ত হইল এবং পেশোয়া ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানকারী কয়েকটি জেলা ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। পেশোয়া ইংরেজদের নির্দেশ অনুযায়ী পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করিতে রাজী হইলেন। পেশোয়া নিজাম ও গাইকোয়াড়ের সহিত তাঁহার বিরোধ মীমাংসার জন্য ইংরেজদের মধ্যস্থতা মানিয়া লইলেন। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি পুণায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। বেসিনের সন্ধির ফলে পেশোয়া তাঁহার স্বাধীনতা হারাইলেন।

পেশোয়ার স্বাধীনতা বিনষ্ট

ওয়েলেসলীর নীতি ছিল মারাঠা শক্তিজোটকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া। কিন্তু দৌলত রাও সিন্ধিয়া, রঘুজী ভোঁসলে এবং যশোবন্ত রাও হোলকার ইংরেজ আধিপত্য মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে ১৮০৩ খৃঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হয় কিন্তু পরাজিত হইয়া ভোঁসলে ইংরেজদের সহিত দেওগাঁয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। তিনি ইংরেজদের কটক ছাড়িয়া দিলেন। সিন্ধিয়া সুরজী-অঙ্গনগাঁওয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন এবং পেশোয়া, গাইকোয়াড়, মুঘল সম্রাট এবং নিজামের উপর বিভিন্ন দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। উড়িষ্যার কোম্পানীর হস্তগত হওয়ায় মাদ্রাজ ও বাংলার মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র স্থাপিত হইল। ভারতে মারাঠা আধিপত্য বিস্তারের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ইহার পর হোলকার পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তাঁহার রাজধানী ইন্দোর অধিকার করিয়া লইল। পরে জর্জ বার্লোরের সময় হোলকার ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

ভোঁসলে সিন্ধিয়া ও হোলকারের বিপর্যয়

লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে পুনরায় মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষ সুরু হয়। পেশোয়ার কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ ইংরেজগণ তাঁহাকে এক নূতন সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী পেশোয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের নেতৃপদ ছাড়িয়া দিলেন এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অনুমতি ব্যতীত কোন দেশী বা বিদেশী কোন শক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন না করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং বিভিন্ন অঞ্চল কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিলেন। এই সন্ধির ফলে পেশোয়ার ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হইল। ভোঁসলেও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। ভোঁসলের রাজ্যের স্বাধীনতা প্রায় বিপুপ্ত হইল। কিন্তু অপমানজনক সন্ধিতে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাও পুণায় ইংরেজ রেসিডেন্টের অফিস ভস্মীভূত করিলেন। কিন্তু পুণা ইংরেজ সৈন্যবাহিনী অধিকার করিয়া লইল। ইতিমধ্যে অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোঁসলে, হোলকার এবং পেশোয়ার সৈন্যবাহিনী ক্রমাগত পরাজিত হইল। হোলকার এক সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া কার্যতঃ ইংরেজ প্রভুত্ব মানিয়া লইলেন (১৮১৮ খৃঃ)। তাঁহার রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিতে রাজী হইলেন এবং ইংরেজদের অনুমতি ব্যতীত কোন শক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন না করিতে স্বীকৃত হইলেন। লর্ড হেষ্টিংস পেশোয়া বংশকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। পেশোয়া পদ বিলুপ্ত করা হইল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কানপুরের নিকট বিথুরে প্রেরণ করা হইল। ১৮৫৩ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর শিবাজীর এক বংশধর প্রতাপ সিংহকে পেশোয়ার রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ প্রদান করা হইল। তিনি সাতারায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। ভোঁসলে রাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যভূক্ত করা হইল এবং বাকী অংশ এক অধীন রাজার শাসনাধীন করা হইল।

পুনরায় যুদ্ধ

পেশোয়াপদ বিলুপ্ত

শিখজাতির অভ্যুদয় (Rise of the Sikhs)ঃ গুরু নানক শিখধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৬৯ খৃঃ লাহোরের পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে তালবন্দী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় নানকের দান অনস্বীকার্য। হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের বাহিক অনুষ্ঠান পছন্দ করিতেন না। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে তিনি মক্কা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি

নানক

সহনশীলতার বাণী প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বহু মুসলমান ছিলেন।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের নীতি

আকবরের শাসনকালে তাঁহার উদার ধর্মনীতির ফলে হিন্দু, রাজপুত ও শিখদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। আকবর শিখগুরু রামদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় যুবরাজ খুসরু বিদ্রোহী হন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহাকে অন্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। যুবরাজ খুসরুকে সাহায্য করিবার অপরাধে পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আকবরের সহিত অর্জুনের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। শিখনেতাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া জাহাঙ্গীর রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে শিখ সম্প্রদায় মুঘল শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি শিখসম্প্রদায়কে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল। ১৫৩৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২ খৃঃ) শিখগুরু হন। অঙ্গদ এবং তাঁহার পরবর্তী শিখগুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪ খৃঃ) উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। পরবর্তী গুরু রামদাসকে আকবর বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রামদাসকে অমৃতসরে একটি পুকুরসহ একখণ্ড জমি দান করেন। এখানে পরবর্তী কালে শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির নির্মিত হয়। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনের নেতৃত্বে শিখজাতি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরবর্তী শিখগুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫ খৃঃ) যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গড়িয়া তোলেন। তাঁহার পিতার উপর ধার্য জরিমানার অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকার করায় জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বারো বৎসর কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ১৬২৮ খৃঃ তিনি শাহাজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অমৃতসরের নিকট এক যুদ্ধে মুঘল সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে কিরাতপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এখানে ১৬৪৫ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, হররাই (১৬৪৫-৬১খৃঃ) শিখগুরু মনোনীত হন। ১৬৬১ খৃঃ হররাইয়ের মৃত্যু হইলে হরকিষেণ (১৬৬১-৬৪ খৃঃ) গুরু মনোনীত হন। হরকিষেণের পর হরগোবিন্দের পুত্র তেগবাহাদুর অধিকাংশ শিখের সমর্থনে শিখগুরু হন। কিরাতপুর হইতে

হরগোবিন্দ

ছয় মাইল দূরে আনন্দপুরে তিনি শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। অল্পদিনের জন্য তিনি বিহারের পাটনায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার পুত্র বিখ্যাত গুরুগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন (১৬৬৬ খৃঃ)। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আনন্দপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের কয়েকটি

তেগবাহাদুর

নীতি এবং নির্দেশের প্রতিবাদ করেন এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের ইহার বিরোধিতা করিতে উৎসাহিত করেন। ক্রুদ্ধ ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। তাঁহাকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অথবা মৃত্যু বরণ করিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি ধর্মত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় সম্রাটের নির্দেশে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ক্রুদ্ধ শিখজাতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। মুঘলশক্তির সহিত তাহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তাঁহার পুত্র এবং পরবর্তী গুরু গুরুগোবিন্দ ভারতের ইতিহাসের এক

গুরুগোবিন্দ

স্মরণীয় পুরুষ। তিনি শিখগণকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলেন। তিনি শিখগণকে দীক্ষা দানের পদ্ধতি প্রচলন করিলেন। যাঁহারা এই নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী দীক্ষা গ্রহণ করিল তাহারা খালসা নামে অভিহিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখ হইতে পলায়ন করা নিষিদ্ধ হইল। বিপর্যস্ত এবং দরিদ্রগণকে সাহায্য করা তাহাদের অন্যতম কর্তব্য হইল। গুরুগোবিন্দের একখানি অতিরিক্ত "গ্রন্থ" (শিখ ধর্মগ্রন্থ) সংকলন করেন। তিনি একাধিক প্রতিবেশী পার্বত্য রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং মুঘল সেনাপতিদের সহিত কৃতিত্বের সহিত লড়াই করেন।

কৃতিত্ব

কথিত আছে যে, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেন এবং পরে তাঁহার সহিত দাক্ষিণাত্যে উপনীত হন। ১৭০৮ খৃঃ গোদাবরী নদীর তীরে নান্দুর নামক স্থানে এক আফগান আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সুরু হয়। এই সুযোগে মারাঠাগণ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হয়। কিন্তু পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহম্মদ শাহ আবদালীর হস্তে মারাঠাগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইহার ফলে পাঞ্জাবে শিখশক্তির অভ্যুদয়ের পথ সুগম হয়। মারাঠা ও মুঘল শক্তির পতনের ফলে উত্তর ভারতে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় তাহার সুযোগে রঞ্জিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে স্বাধীন শিখজাতির অভ্যুদয় হয়।

রঞ্জিৎ সিংহ (Ranjit Singh) : ১৭৮০ খৃঃ (নভেম্বর) রঞ্জিৎ সিংহ

জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে রঞ্জিৎ সিংহ নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে ও রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। আহম্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র জামানশাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন (১৭৯৮ খৃঃ) তখন রঞ্জিৎ তাঁহার সহিত যোগদান করেন। কিন্তু জামানশাহের প্রত্যাবর্তনের সময় রঞ্জিত লাহোর অধিকার করেন (১৭৯৯ খৃঃ)। যামানশাহ তাঁহার সাফল্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পরই রঞ্জিৎ অমৃতসর অধিকার করেন। তাঁর শ্বশ্রূমাতা সাদা কাউর ছিলেন কানেহা মিসিলের নেত্রী এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফতে সিংহ ছিলেন আহলুওয়ালা মিসিলের নেতা। ইহাদের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত মিসিলের উপর এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের উপর তিনি স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

শক্তিশালী শিখ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

স্যার জর্জ বার্লোর নিরপেক্ষ নীতির সুযোগে রঞ্জিৎ শতদ্রু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত শিখ সর্দারদের রাজ্য বিজয়ে অগ্রসর হন। এই অঞ্চল সিরহিন্দ নামে পরিচিত ছিল। ১৮০৬ খৃঃ সিরহিন্দের শিখ সর্দারদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। অসন্তুষ্ট কয়েকজন শিখ সর্দার রঞ্জিৎ সিংহকে সিরহিন্দ আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান। রঞ্জিৎ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করেন। ইহাতে ভীত হইয়া শিখ সর্দারগণ ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো রঞ্জিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি চার্লস মেটকাফকে রঞ্জিত সিংহের দরবারে প্রেরণ করিয়া শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্য-সীমা নির্ধারণের দাবী জানাইলেন। ১৮০৯ খৃঃ রঞ্জিৎ সিংহ ইংরেজদের সহিত অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। ইহার শর্ত অনুযায়ী শতদ্রু নদী ইংরেজ ও শিখরাজ্যের মধ্যে সীমারেখা বলিয়া স্বীকৃত হইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

অমৃতসরের সন্ধি

অমৃতসরের সন্ধির পর রঞ্জিৎ সিংহ পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যগুলি, মুলতান, কাশ্মীর, খোটক, টংক, বান্নু, দেরাগাজী খান, দেরা ইসমাইল খান এবং পেশোয়ার অধিকার করেন। রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্য শতদ্রু হইতে খাইবার পর্যন্ত এবং "ক্ষুদ্র তিব্বত" হইতে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

রাজ্যবিস্তার

আফগানদের সহিত রঞ্জিৎ সিংহকে একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ১৮১৩ খৃঃ আফগান নেতা ফতেখান চার্চের যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাজিত হন। ১৮২৩ খৃঃ নওসেয়ার যুদ্ধে আফগানগণ দ্বিতীয়বার তাঁহার হস্তে পরাজিত হন।

১৮৩৭ খৃঃ আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদ জামরুদ এবং সাবকুতুর অধিকারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলে রঞ্জিৎ সিংহের সহিত পুনরায় আফগানদের সংঘর্ষ হয়। আফগান সৈন্যবাহিনী দুর্গ দুইটি অধিকার করিতে ব্যর্থ হয়। ১৮৩৮-৩৯ খৃঃ রঞ্জিৎ সিংহ প্রথম আফগান যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করেন। তাঁহার জীবিতকালে ইংরেজদের সহিত মৈত্রী অক্ষুণ্ণ ছিল।

আফগানদের সহিত যুদ্ধ

রঞ্জিৎ সিংহ শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার কোন গোঁড়ামী ছিল না। যে কোন ধর্মাবলম্বী উপযুক্ত লোককে তিনি শাসনকার্যে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী সুদক্ষ এবং শক্তিশালী ছিল। সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী করিবার জন্য ফরাসীদের দ্বারা সৈন্যদের সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাহার সৈন্যবাহিনীতে চল্লিশ হাজার স্থায়ী সৈন্য ছিল। রাজকোষ হইতে ইহাদের বেতন দেওয়া হইত। কৃষক ও বণিকদের উপর যাহাতে অত্যাচার না হয় তাহার প্রতি রঞ্জিৎ সিংহ লক্ষ্য রাখিতেন।

রঞ্জিৎ সিংহের শাসনব্যবস্থা

রঞ্জিৎ সিংহের কৃতিত্ব (Estimate of Ranjit Singh) ঃ রঞ্জিৎ সিংহ নিরক্ষর হইলেও প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন নিপুণ যোদ্ধা, সুদক্ষ এবং প্রজাহিতৈষী শাসক। বিচ্ছিন্ন এবং বিবদমান শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী শিখ রাষ্ট্র গঠন তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব। অ্যালার্ড, ভেন্টুরা প্রভৃতি ফরাসী সেনানায়কদের দ্বারা তিনি সৈন্য-বাহিনীকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষা-প্রদান করিয়াছিলেন। নবগঠিত শিখরাজ্যকে আফগান আক্রমণ হইতে রক্ষা করা তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব। তাঁহার উদার মনোভাবের জন্য তিনি শিখ, হিন্দু, মুসলমান প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের অকুণ্ঠ আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে শিখজাতি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী পর্যটক জ্যাকিমো তাঁহাকে "এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ক্ষুদ্র সংস্করণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। জার্মান পর্যটক ভনহুগেলও তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩৯ খৃঃ রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।



রঞ্জিৎ সিংহ

দ্বাদশ অধ্যায়

ইউরোপীয়দের আগমন : ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ

(Advent of the Europeans : Anglo-French Rivalry)

পর্তুগীজগণ (The Portuguese) : সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। ইউরোপের বাজারে ভারতীয় পণ্যের বিশেষ চাহিদা ছিল। সপ্তম শতাব্দীর পর হইতে মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমশঃ আরব প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে আরব বণিকগণ ভারতীয় পণ্য জেনোয়া, ভেনিস, মিলান প্রভৃতি ইটালীর বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে বিক্রয় করিত। ক্রমে ইউরোপের বণিকগণ এই লাভজনক ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হইল। পর্তুগীজগণ এই বিষয়ে অগ্রণী হইল। ১৪৮৭ খৃঃ বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামক একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকা মহাদেশের উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া পর্তুগীজ বণিকদের নূতন পথের সন্ধান দিলেন। ১৪৯৮ খৃঃ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলেন। ১৪৯৯ খৃঃ তিনি পর্তুগালে ফিরিয়া যান। ১৫০০ খৃঃ ক্যাব্রাল নামে অপর একজন পর্তুগীজ নাবিক ভারতে আসেন। তিনি কালিকটে একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। কিন্তু পর্তুগীজগণ অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বিতাড়িত করিয়া একচেটিয়া বাণিজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইলে কালিকটের জামেরিণ (রাজা) পর্তুগীজ বাণিজ্য-কুঠি ধ্বংস করিয়া দিলেন। কিন্তু পর্তুগীজগণ কোচিনের রাজার সাহায্য লাভ করে। ১৫০২ খৃঃ ভাস্কো-ডা-গামা কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া ভারতে আসেন। কোচিনে একটি বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিয়া এবং ইহার রক্ষার্থে একটি ক্ষুদ্র নৌবহর রাখিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভাস্কো-ডা-গামা ও ক্যাব্রাল



ভাস্কো-ডা-গামা

কোচিনে বাণিজ্য কুঠিস্থাপন

ইহার অল্পকাল পরে জামোরিণ পর্তুগীজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। পর্তুগীজ সরকার ভারতে বাণিজ্য-কুঠিগুলি রক্ষার জন্য একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ফ্রান্সিসকো-ডি-আলমিডা প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার পর আলবুকার্ক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি গোয়া, মালাক্কা ও অরমুজ অধিকার করেন। পরবর্তী পর্তুগীজ শাসকদের আমলে দিউ, দমন, সলসেট, বেসিন, চৌল, বোম্বে, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ ঘাঁটি স্থাপিত হয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইহাদের পতন আরম্ভ হয়। ইহাদের জলদস্যুতা এবং ব্যাপক-ভাবে হিন্দু ও মুসলমান বালক-বালিকাদের অপহরণ করিয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিবার ফলে সর্বত্র সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে হুগলীর পর্তুগীজ বাণিজ্য-কেন্দ্র ধ্বংস করা হয় এবং পর্তুগীজদের বন্দী করা হয়। ক্রমে গোয়া, দমন ও দিউ ব্যতীত সকল স্থান তাহাদের হস্তচ্যুত হয়।

আলবুকার্ক পতন

ওলন্দাজগণ (The Dutch): পর্তুগীজদের পর ওলন্দাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসে। ওলন্দাজ বা ডাচ বণিকগণ ১৬০২ খৃঃ নেদারল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিল। পর্তুগীজদের নিকট হইতে তাহারা মলুক্কাস ও মালাক্কা অধিকার করে এবং জাভা ও সুমাত্রায় আধিপত্য বিস্তার করে। জাকার্তা জয় করিয়া তাহারা বাটাভিয়া নামে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে এবং সিংহল হইতে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে। দূরপ্রাচ্যে ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে পুলিকট, সুরাট, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালেশ্বর, নেগাপট্টম, কোচিন প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের সহিত তাহাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। ভারতে এবং ইংরেজদের হস্তে তাহারা পরাজিত হয়। ১৭৫৯ খৃঃ বিদরের যুদ্ধে তাহারা পরাজিত এবং হুগলী নদীতে তাহাদের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হয়। ১৭৮১ খৃঃ নেগাপট্টম ইংরেজরা অধিকার করিয়া লয়। ক্রমে অধিকাংশ ওলন্দাজ বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি ইংরেজদের হস্তগত হয়। ওলন্দাজগণ মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি সংযত করে।

ইংরেজগণ (The English): ইংরেজ বণিকগণ ১৬০৮ খৃঃ সর্বপ্রথম ভারতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের চেষ্টা করে। ইহার পূর্বে ১৬০০ খৃঃ প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে

একচেটিয়া বাণিজ্যের সনন্দ প্রাপ্ত হয়। ১৬১১ খৃঃ সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বরাটে বাণিজ্য-কুঠিস্থাপনের জন্য ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু তিনি ১৬১৩ খৃঃ স্বরাটে ইংরেজদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। ইহার পর মুঘল সম্রাটের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি প্রায় তিন বৎসর জাহাঙ্গীরের দরবারে ছিলেন। কোন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিতে না পারিলেও তিনি বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পাইলেন। ইংরেজগণ ১৬১৬ খৃঃ মসুলিপট্টমে এবং ১৬৩৩ খৃঃ হরিহরপুর ও বালেশ্বরে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৩২ খৃঃ বার্ষিক পাঁচশত মুদ্রার বিনিময়ে ইংরেজগণ গোলকুণ্ডার সুলতানের বন্দরগুলিতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পায়। ১৬৩৯ খৃঃ ইংরেজগণ মাদ্রাজের ইজারা প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইংরেজগণ হুগলী, পাটনা এবং কাশিমবাজারে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করে। ইংরেজগণ তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য সৈন্য-বাহিনী গঠনে উদ্যোগী হয়। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে স্যার জন চাইল্ড পশ্চিম উপকূলের মুঘল বন্দরগুলি আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘল সামরিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দেড়লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হইতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করেন। ১৬৫১ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুলতান সুজার নিকট হইতে বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করেন। ইহার পর কোম্পানীর সৈন্যদল বাংলাদেশে বিভিন্ন মুঘল দুর্গ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে। কিন্তু তাহারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। কোম্পানীর প্রতিনিধি জব চার্ণক মুঘল সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে পুনরায় কোম্পানী বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এবং মাত্র বারো শত টাকার বিনিময়ে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী প্রাপ্ত হয়। ১৬৯০ খৃঃ জব চার্ণক কলিকাতা মহানগরীর পত্তন করেন। এখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত হয়। ১৭১৫ খৃঃ সম্রাট ফরুকসিয়ার ইংরেজদের নানাবিধ বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। কোম্পানী নিজের মুদ্রা প্রচলন করিবার অনুমতি পাইল। ইহার ফলে কোম্পানীর বাণিজ্য

বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র

জব চার্ণক, কলিকাতার পত্তন

দ্রুত উন্নতিলাভ করিল এবং ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম হইল।

ফরাসীগণ (The French) ঃ ফরাসীগণই সর্বশেষে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। ১৬৬৪ খৃঃ ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। ১৬৬৮ খৃঃ সুরাটে প্রথম ফরাসী বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৬৯ খৃঃ তাহারা মসুলিপট্টমে আর একটি বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে এবং ১৬৭৩ খৃঃ তাহারা একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পণ্ডিচেরীর পত্তন করে। ১৬৮৪ খৃঃ ফরাসীগণ বাংলার শাসনকর্তার নিকট ক্ষুদ্র স্থান লাভ করেন। এখানে তাহারা একটি বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে। এই স্থানটি পরে চন্দননগর নামে পরিচিত হয়। তাহারা ১৭২১ খৃঃ মরিসাস, ১৭২৫ খৃঃ মাহে এবং ১৭৩০ খৃঃ কারিকল অধিকার করে। ১৭৪২ খৃঃ পর্যন্ত তাহাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ডুপ্লে ভারতে আগমন করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। ফলে ইংরেজদের সহিত ফরাসীদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল এবং ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

চন্দননগরের পত্তন

অন্যান্য ইউরোপীয়গণ (Other Europeans) ঃ পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসীগণ ছাড়াও দিনেমার, অস্ট্রিয়ান, সুইডিস প্রভৃতি বণিকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল কিন্তু ইহাতে বাণিজ্য করিবার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ (Anglo-French Struggle in the Deccan) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং ভারতীয় নৃপতিগণের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে বিদেশী বণিকদের শক্তিবৃদ্ধিতে কেহই বাধাদান করিতে পারেন নাই। ১৭৪০ খৃঃ ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৭৪৬ খৃঃ এই যুদ্ধ ভারতে বিস্তৃত হয়। ফরাসীগণ মাদ্রাজ অধিকার করিয়া লয়। কর্ণাটকের নবাব ক্ষুব্ধ হন কারণ ইংরেজ-অধিকৃত হইলেও মাদ্রাজ তাঁহার রাজ্যমধ্যে অবস্থিত ছিল। তাঁহার বিনা অনুমতিতে ফরাসীগণ মাদ্রাজ অধিকার করায় তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু সেণ্ট থোমের যুদ্ধে তাঁহার দশ হাজার সৈন্য ফরাসীদের পাঁচশত সৈন্যের হস্তে ভীষণ ভাবে পরাজিত হইল। ডুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখিলেন। আয়েক্সলা চ্যাপেলের সন্ধির দ্বারা অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ

যুদ্ধের অবসান হইলে ভারতেও শান্তি স্থাপিত হয়। ফরাসীরা ইংরেজদের সাম্রাজ্য ফিরাইয়া দেয়।

কিন্তু ১৭৪৯ খৃঃ হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ লইয়া দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ সুরু হয়। ১৭৪৮ খৃঃ নিজামের মৃত্যু হইলে হায়দ্রাবাদের সিংহাসন লইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মুজঃফরজঙ্গের মধ্যে বিরোধ সুরু হয়। কর্ণাটক বা আর্কটের সিংহাসন লইয়া আনোয়ারউদ্দিন ও চাঁদসাহেবের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। ডুপ্লে মুজঃফর-জঙ্গ ও চাঁদসাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের মিলিত বাহিনী আনোয়ারউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করিল। ইংরেজরা নাসিরজঙ্গ ও আনোয়ারউদ্দিনকে সমর্থন করিয়াছিলেন। চাঁদসাহেব কর্ণাটকের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ফরাসীদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। ইংরেজরা আনোয়ারউদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলিকে সমর্থন করিল। ইংরেজদের সাহায্যে নাসিরজঙ্গ আর্কট হইতে চাঁদা-সাহেবকে বিতাড়িত করিলেন এবং মুজঃফরজঙ্গ তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু নাসিরজঙ্গ কুদাপ্পার নবাবের হস্তে নিহত হইলে ফরাসীরা মুজফঃরজঙ্গকে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসাইল। কিন্তু তিনিও আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে ফরাসী সেনাপতি বুসী সালাবতজঙ্গকে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থে বুসী সৈন্যসহ হায়দ্রাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীর খরচ বহনের জন্য চারিটি জেলা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের নীতি সাময়িকভাবে সফল হইল। কিন্তু ক্লাইভের কৃতিত্বের ফলে ফরাসী আধিপত্য বিনষ্ট হইল। কর্ণাটকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৭৫২ খৃঃ ত্রিচিনাপল্লীতে অবরোধকারী ফরাসী সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। ক্লাইভ চাঁদসাহেবের রাজধানী আর্কট অধিকার করিলেন এবং চাঁদসাহেবের সকল আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। চাঁদসাহেব অবশেষে ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়। মহম্মদ আলি আর্কটের নবাব হইলেন। কিন্তু ডুপ্লে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি মহীশূরের রাজা

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ



ডুপ্লে

ও গুটির মারাঠা নায়কের সহিত সংঘবদ্ধ হইলেন এবং ব্যক্তিগত তহবিল হইতে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭৫৪ খৃঃ গডেহ্‌ ডুপ্লের স্থলে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ডুপ্লে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাঁহার কর্ণাটক-সংক্রান্ত নীতি পরিত্যক্ত হইল।

১৭৫৬ খৃঃ ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হইয়া যায়। বাংলাদেশে ইংরেজগণ সিরাজউদ্দৌলার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ফরাসী সেনাপতি হায়দ্রাবাদে ফরাসী আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। ফলে তিনি বাংলায় বা মাদ্রাজে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। ক্লাইভ সহজে চন্দননগর অধিকার করিলেন এবং ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিলেন। সেনাপতি লালী মাদ্রাজের অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ

কর্ণেল ফোর্ডের নিকট ফরাসী বাহিনী বারংবার পরাজিত হইল। পণ্ডিচেরীর নিকট ফরাসী নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইল এবং ১৭৬১ খৃঃ পণ্ডিচেরীর পতন হইল। ইহার পূর্বে ১৭৬০ খৃঃ স্যার আয়ার কূট বন্দিবাসের যুদ্ধে লালীকে পরাজিত করেন। গিন্‌হি ও মাহে ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইল। ভারতে ফরাসী আধিপত্য বিনষ্ট হইল। ১৭৬৩ খৃঃ প্যারিসের সন্ধির ফলে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং ইংরেজগণ যুদ্ধের সময় অধিকৃত ফরাসী স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

. ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তার

(Expansion of British Power in India)

বাংলাদেশে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়ঃ ক্লাইভ হইতে লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল পর্যন্ত সময়কে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ বলা যায়। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে ক্লাইভ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ সুরু হইয়াছিল। বাংলাদেশে ইংরেজ ও ফরাসীগণ দুর্গ নির্মাণ করিয়া নিজেদের সুরক্ষিত করিতে লাগিল। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। ফরাসীগণ এই আদেশ পালন করিলেও ইংরেজগণ তাঁহার নির্দেশ অগ্রাহ্য করিল। ফলে সিরাজের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ঘসেটি বেগম, মীরজাফর প্রমুখ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠি অধিকার করিবার পর সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ শাসনকর্তা ড্রেক পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সিরাজ কলিকাতা অধিকার করিয়া ইংরেজদের বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ ১২৩ জন ইংরেজ শাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত হইয়া সিরাজের চরিত্রে কলংক লেপন করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ কোন ঘটনা সত্যিই ঘটিয়াছিল কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। সমসাময়িক কোন রচনায় ইহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ বন্দী ইংরেজদের কেহ কেহ ক্লান্ত ও ভীত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাকেই ইংরেজ লেখক হলওয়েল 'অন্ধকূপ হত্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইংরেজদের সহিত সিরাজের সংঘাত

অন্ধকূপ হত্যা

সিরাজের কলিকাতা অধিকারের সংবাদ পাইয়াই মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কলিকাতা পুনরধিকারের জন্য ক্লাইভের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ক্লাইভ সহজেই কলিকাতা অধিকার করিলেন। সামান্য যুদ্ধের পর সিরাজ ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইংরেজ কোম্পানীকে পূর্বের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইল এবং কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ

করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। কিন্তু শীঘ্রই নবাবের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের সময় নবাবের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করিলেন। নানা কারণে সিরাজ ফরাসীদের সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু চন্দননগর হইতে পলাতক ফরাসীদের সাহায্য প্রদান করেন এবং ফরাসী সেনাপতি বুসীর সহিত পত্রালাপ করিতেছিলেন। ইংরেজরা ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন।

সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

এই সময় সিরাজের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাবপদে বসাইবার চক্রান্ত করিতেছিলেন। ক্লাইভ সানন্দচিত্তে ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। সিরাজের বিরোধী নায়কগণ ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মীরজাফর সিংহাসন প্রাপ্তির বিনিময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং বাংলাদেশ হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিতে রাজী হইলেন।



সিরাজউদ্দৌলা

পলাশীর যুদ্ধ (Battle of Plassey): অতঃপর ক্লাইভ আটশত ইউরোপীয় সৈন্য এবং দুই হাজার দুই শত সিপাহী লইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। পলাশীর প্রান্তরে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। নবাবের চতুর্দিকে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও ইয়ার লতিফ মুর্শিদাবাদের ইংরেজ রেসিডেণ্ট ওয়াটসের সহিত এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করিয়া যুদ্ধের সময় যুদ্ধ না করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়

১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণের অধীন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ না করিয়া নিশ্চল রহিল। সেনাপতি মীরমদন নিহত হইলেন। মোহনলাল ও সিনফ্রের অধীন মুষ্টিমেয় সৈন্য ইংরেজদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু ভীত নবাব মোহনলালের প্রতিবাদ সত্ত্বেও মীরজাফরের পরামর্শে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যগণ পাল্টা আক্রমণ করিল। নবাববাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। নবাব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য-একচেটিয়া হইয়াছিল এবং দেশীয় বণিক-শ্রেণীর পতন আরম্ভ হইয়াছিল। বাংলাদেশে ইংরেজগণ কার্যতঃ সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল। বাংলার পরবর্তী নবাবগণ নামেমাত্র নবাব হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ ভারতে স্থায়ী শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের আশা নির্মূল হইয়াছিল।

আর্থিক সংকট

মীরজাফর ও মীরকাশিম ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। নিদারুণ আর্থিক সংকট সত্ত্বেও মীরজাফর কোম্পানীর কর্মচারিগণকে বহুমূল্য উপঢৌকন এবং কোম্পানীকে প্রচুর ক্ষতি-পূরণ প্রদান করেন। ক্লাইভ নবাবের নিকট হইতে জায়গীর পাইলেন। ফলে মীরজাফরের রাজকোষের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। দিল্লীর সম্রাট আলমগীরের পুত্র আলি গওহর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বিহার আক্রমণ করে। কিন্তু মীরজাফর ক্লাইভের সাহায্যে তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। পর বৎসর আলি গওহর শাহ আলম নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পুনরায় বিহারে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মীরজাফর ইংরেজদের ক্ষমতামুক্ত হইবার জন্য ওলন্দাজদের সহিত চক্রান্ত করিতেছিলেন। কিন্তু ওলন্দাজগণ বিদরের যুদ্ধে ইংরেজদের হস্তে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। কোম্পানী মীরজাফরকে মসনদ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

মীরজাফরের সিংহাসন ত্যাগ

ভান্সিটার্ট ক্লাইভের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভান্সিটার্ট ও কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিল মীরজাফরকে মীরকাশিমের অনুকূলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করাইলেন।

মীরকাশিম ইংরেজদের চক্রান্তের ফলে নবাব হইলেও তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন। পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী মীরকাশিম কোম্পানীর প্রচুর অর্থ এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা অর্পণ করিলেন তথাপি তাঁহার কৃতিত্বের ফলে রাজ্যের রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। মীরকাশিম স্বাধীনচেতা নবাব ছিলেন। ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য চক্রান্ত এবং দুর্নীতির কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ হইতে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষা দান করেন এবং মুঙ্গেরে একটি অস্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। শীঘ্রই শুল্ক-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোম্পানীর সহিত তাঁহার বিরোধ সুরু হয়। দিল্লীর নবাবের ফারমানের বলে ইংরেজ কোম্পানী বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিত। কিন্তু এই সুযোগের অপব্যবহার করিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ কোম্পানীর নৌকায় এবং জাহাজে বে-আইনী ভাবে বাণিজ্য করিত এবং নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দিত। নবাব যখন কোম্পানীর কর্মচারিগণের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করিতে পারিলেন না তখন ইংরেজদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে এবং দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য বাণিজ্য শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। নবাবের এই নির্দেশের ফলে কোম্পানী ক্রুদ্ধ হইল। পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস পাটনা আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু কাটোয়া, গিরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট পলায়ন করিলেন। অতঃপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মীরকাশিমের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনী বকসারের যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। মীরকাশিম পলায়ন করিলেন এবং ১৭৭৭ খৃঃ দিল্লীতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুঘল সম্রাট ইরেজদের পক্ষে যোগদান করিলেন। সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পলায়ন করিলেন। অযোধ্যা ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করিল।

মীরকাশিম

ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ

মীরকাশিমের পরাজয়

কোম্পানী মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইল এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ আদায় করিল। ১৭৬৫ খৃঃ মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নাজিমউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নামেমাত্র নবাব রহিলেন। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হস্তগত হইল। ১৭৬৫ খৃঃ ক্লাইভ পুনরায় বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি ও দেওয়ানী লাভ ঃ ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার সর্ত অনুযায়ী নবাব নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। কোম্পানী ও নবাবের মধ্যে এক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত কোরা এবং এলাহাবাদ মুঘল সম্রাটকে প্রদান করা হইল।



ক্লাইভের দেওয়ানী গ্রহণ

ক্লাইভের উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সম্রাটকে ধ্বংস না করিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং যথাসম্ভব সমর্থন করা। এইজন্য কোরা এবং এলাহাবাদ মুঘল সম্রাটকে প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলাদেশে কোম্পানীর ক্ষমতা আইনগত ভাবে স্বীকৃত হইল। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত হইল। বাংলার নবাব বার্ষিক মাত্র তিপান্ন লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা রক্ষার



ক্লাইভ

ভার বা সামরিক বিভাগ কোম্পানীর হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। ফলে বাংলাদেশে

কোম্পানী সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল। রাজস্ববিভাগ কোম্পানীর হস্তগত হওয়ায় নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী ব্যক্তিতে পরিণত হইলেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ঃ ১৭৭২ খৃঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাংলাদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে ভারতে ইংরেজ শক্তি আরও বিস্তার লাভ করে। তিনি ক্লাইভের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন সাধন করেন সম্রাট শাহ্ আলম মারাঠাদের সহিত যোগদান করায় কোরা এবং এলাহাবাদ মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে ফিরাইয়া দিলেন। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানীর পরিবর্তে কোম্পানী মুঘল সম্রাটকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর প্রদান করিত। তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া অযোধ্যাকে শক্তিশালী করিতে অগ্রসর হইলেন। এই নীতির ফলে কোম্পানী রোহিলা-যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল। ইংরেজ সাহায্যে অযোধ্যার নবাব রোহিলাদের পরাজিত করিয়া রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

অযোধ্যার নবাবের সহিত মিত্রতা

হেষ্টিংসের মারাঠা-নীতিও সফল হয় নাই। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা-শক্তি ধ্বংস করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পেশোয়ার পদ লইয়া রঘুনাথ রাও ও মাধব রাও নারায়ণের মধ্যে বিরোধে ইংরেজরা জড়াইয়া পড়ে। কোম্পানীর বোম্বে কর্তৃপক্ষ রঘুনাথ রাওয়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করে। কিন্তু কোম্পানীর কাউন্সিল ইহা অগ্রাহ্য করিয়া পুনা কর্তৃপক্ষের সহিত পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করে। কিন্তু বোম্বে কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের ফলে যুদ্ধ পুনরায় সুরু হয়। অবশেষে মাহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সলবাইয়ের সন্ধির দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। ইংরেজরা সলসেট পাইল কিন্তু অধিকৃত মারাঠা অঞ্চলগুলি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। হেষ্টিংস মারাঠা-শক্তি ধ্বংস করিতে পারিলেন না।

মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ



ওয়ারেণ হেষ্টিংস

মহীশূর ঃ হায়দার আলির অভ্যুদয় ঃ ইংরেজ-সাম্রাজ্য বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে হেষ্টিংসকে মহীশূরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। হায়দার আলি সামান্য একজন সৈনিকের পদ হইতে নিজ

প্রতিভার বলে মহীশূর রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। ১৭৬১ খৃঃ তিনি মহীশূর রাজ্যের সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন। মহীশূরে নিজের ক্ষমতা সংহত করিবার পর হায়দার বিভিন্ন স্থান অধিকার করেন। তিনি তিনবার মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু মারাঠাদের মধ্যে বিশৃংখলার সুযোগে বিস্তীর্ণ মারাঠা অঞ্চল অধিকার করেন। হায়দারের শক্তি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে মারাঠা, নিজাম এবং ইংরেজগণ সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৬৬ খৃঃ মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল এবং পেশোয়া প্রথম মাধব রাও মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। হায়দার কূটনীতির সাহায্যে পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিলেন এবং নিজামকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ফলে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সুরু হয় (১৭৬৭-৬৯ খৃঃ)। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিজিত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিল এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু ১৭৮০ খৃঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফ্রান্স আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির পক্ষ অবলম্বন করায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়। হায়দারের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজগণ মাহে অধিকার করিলে হায়দার ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজামের সহিত যোগদান করিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ১৭৮২ খৃঃ হায়দার মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৭৮৩ খৃঃ ভার্সাইয়ের সন্ধি দ্বারা ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু হায়দারের পুত্র টিপু সুলতান একাকী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। ১৭৮৪ খৃঃ ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। উভয়পক্ষ পরস্পরের বিজিত স্থানসমূহ এবং যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ করে।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ



হায়দার আলি

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে পুনরায় টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। টিপু মনে করিতেন ইংরেজরাই তাঁহার প্রধান শত্রু। ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজ শক্তি সংহত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন।

কর্ণওয়ালিসও টিপুর শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য পেশোয়া ও নিজামের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ইংরেজরা ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির সর্তভঙ্গ করায় টিপু ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ-আশ্রিত ত্রিবাংকুর রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধ সুরু হইল। কিন্তু ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া টিপু সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি দ্বারা (১৭৯৩ খৃঃ) টিপু তাঁহার রাজ্যের অর্ধেক ছাড়িয়া দিলেন ও ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন এবং প্রতিভূস্বরূপ দুই পুত্রকে ইংরেজদের হস্তে প্রদান করিলেন।

টিপু সুলতানের পরাজয়

লর্ড ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর স্যার জনশোর গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু ১৭৯৮ খৃঃ লর্ড ওয়েলেসলী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফলে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই নীতি গ্রহণকারী দেশীয় নৃপতিগণ, (১) ইংরেজ সরকারের অনুমতি ব্যতীত বৈদেশিক নীতি বা সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে পারিবেন না; (২) নিজ নিজ রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিবেন এবং ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের একাংশ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিবেন; (৩) সৈন্যবাহিনীর ইংরেজ ব্যবতীত অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মচারীদের বিতাড়িত করিবেন। এই সর্তগুলি গ্রহণ করিবার বিনিময়ে কোম্পানী নৃপতিগণকে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবে। ইহার ফলে এই নীতি অনুযায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ নৃপতিগণ নামেমাত্র শাসক রহিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ নিজাম কোম্পানীর সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হইলেন। ওয়েলেসলী টিপুকে এই নীতি অনুযায়ী সন্ধি স্থাপনে আহ্বান জানাইলেন। টিপু এই অপমানকর প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিল। টিপু বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। টিপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহীশূরের গৌরবময় ইতিহাসের অবসান হইল। টিপুর রাজ্যের বিরাট অংশ কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ক্ষুদ্র একটি অংশ নিজামকে দেওয়া হইল। বাকী অংশ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করিয়া হিন্দু রাজবংশের একজনকে সিংহাসনে বসান হইল। নূতন রাজাকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ করা হইল। ইহার

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

পর ওয়েলেসলী তাঞ্জোর, সুরাট এবং কর্ণাটক কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। ১৮০১ খৃঃ অযোধ্যার নবাবকে একটি নূতন সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হইল। নবাব বিরাট ভূখণ্ড ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন এবং অধিক সংখ্যায় কোম্পানীর সৈন্য নিয়োগ করিতে রাজী হইলেন। ১৮০২ খৃঃ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিয়া বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। পেশোয়া কয়েকটি জেলা ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজ রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিতে রাজী হইলেন।



টিপুসুলতান

কিন্তু তিনজন মারাঠানেতা দৌলতরাও সিন্ধিয়া, রঘুজি ভোঁসলে এবং যশোবন্তরাও হোলকার ইংরেজ আধিপত্য স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। ফলে ১৮০৩ খৃঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভোঁসলে এবং সিন্ধিয়া পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। ভোঁসলে দেওগাঁওয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া কটক ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন। সিন্ধিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিলেন এবং সুরজী অঞ্জনগাঁওয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। হোলকার পাঞ্জাবে পলাইয়া গেলেন।

এই যুদ্ধের ফলে ভারতে কোম্পানীর সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং উড়িষ্যা কোম্পানীর হস্তগত হওয়ায় বাংলা ও মাদ্রাজের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র স্থাপিত হইল। ১৮০৩ খৃঃ সুরজী অঞ্জনগাঁওয়ের সন্ধির ফলে সিন্ধিয়া অন্যান্য অঞ্চলের সহিত দিল্লী এবং আগ্রা ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। লর্ড লেক দিল্লী প্রবেশ করিলে সম্রাট শাহ আলম তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহার সহিত কোন সন্ধি স্বাক্ষর করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলাফল

লর্ড মিণ্টোর নীতি ঃ ১৮০৭ খৃঃ লর্ড মিণ্টো ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই সময়ে রঞ্জিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। শতদ্রু নদীর পশ্চিমে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অমৃতসর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৮০৬ খৃঃ শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত সিরহিন্দের শিখ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধের সুযোগে রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করেন। ইহাতে

ভীত হইয়া শিখ নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। লর্ড মিণ্টো চার্লস মেটকাফকে রঞ্জিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করেন। অবশেষে অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা (১৮০৯ খৃঃ) রঞ্জিৎ সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শতদ্রু নদী ব্রিটিশ ও শিখরাজ্যের মধ্যে সীমারেখা বলিয়া স্বীকৃত হইল। লর্ড মিণ্টো সিন্ধু প্রদেশের আমীরদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ফলে এই অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তৃত হয় ও ফরাসীগণ বিতাড়িত হয়।

রঞ্জিৎ সিংহ
অমৃতসরের সন্ধি

লর্ড হেস্টিংসের সাম্রাজ্যবাদী নীতিঃ ১৮১৩ খৃঃ লর্ড হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৮১৪ খৃঃ নেপাল যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। গুর্খা-গণ তিস্তা হইতে পশ্চিমে শতদ্রু পর্যন্ত সমগ্র হিমালয় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইংরেজগণ গোরক্ষপুর অধিকার করিবার ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্য নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সীমান্ত সংঘর্ষের সৃষ্টি হইতে থাকে। অবশেষে গুর্খাগণ ইংরেজ-অধিকৃত ভুটওয়াল ও শিওরাজ অধিকার করিলে নেপাল যুদ্ধ সুরু হয়। গুর্খা সেনাপতি অমর সিং পরাজিত হন এবং সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। সগৌলির সন্ধি দ্বারা গুর্খাগণ গাড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলা এবং তরাই অঞ্চলের আলমোড়া, মুসৌরী, সিমলা, নৈনিতাল, লাণ্ডোয়ার প্রভৃতি স্থান ইংরেজদের অর্পণ করে। গুর্খাগণ সিকিমের উপর দাবি পরিত্যাগ করে এবং কাঠমাণ্ডুতে ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হয়। ১৮১৭ খৃঃ ইংরেজগণ সিকিমের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া তরাই অঞ্চলের একাংশ সিকিমকে অর্পণ করিল।

নেপাল যুদ্ধ

লর্ড হেষ্টিংস পিণ্ডারীদের দমন করিয়া মালব, মধ্যভারত ও রাজপুতনার বিস্তৃত অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন।

১৮১৬ খৃঃ লর্ড হেষ্টিংস পেশোয়াকে একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। ইহার সর্ত অনুযায়ী পেশোয়া মারাঠা রাজ্যের নেতৃপদ ছাড়িয়া দিলেন এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইংরেজদের অর্পণ করিলেন। ফলে তাঁহার ক্ষমতা বিনষ্ট হইল। ভোঁসলেকেও অধীনতামূলক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু ক্ষুব্ধ মারাঠা নায়কগণের সহিত ইংরেজদের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে পেশোয়া, হোলকার এবং ভোঁসলে সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। হোলকার তাঁহার রাজ্যের এক বিরাট অংশ ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিতে এবং ইংরেজ রেসিডেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন শক্তির সহিত যোগাযোগ না করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পেশোয়াকে পদচ্যুত করা হইল এবং পেশোয়া পদ বিলুপ্ত করা হইল। পেশোয়া বাজীরাওকে কানপুরের নিকট বিথুরে প্রেরণ করা হইল এবং তাঁহাকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল। শিবাজীর এক বংশধর প্রতাপসিংহকে পেশোয়া রাজ্যের এক অংশ প্রদান করা হইল। তিনি সাতারায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। পেশোয়া রাজ্যের বাকী অংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ভোঁসলে রাজ্যের সাগর এবং নর্মদা অঞ্চল ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল এবং বাকী অংশ এক অধীন রাজার শাসনাধীন করা হইল। এইভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ বিরোধী শক্তি মারাঠাদের ধ্বংস করা হইল। হেষ্টিংস রাজপুত রাজ্যগুলির সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজপুতনায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার সময়ে মধ্যভারতে ভূপাল, মালব ও বুন্দেলখণ্ডে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল।

মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ, মারাঠা শক্তি ধ্বংস

ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ১৮২৪-২৬ খৃঃ লর্ড আমহার্স্টের সময় ইংরেজরা ব্রহ্মদেশে আধিপত্য বিস্তার করে। ইহার পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় অহোমরাজ গৌরীনাথ সিংহের অনুরোধে অহোমরাজ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অহোমরাজ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে বর্মিগণ আসামে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে এবং ১৮১২ খৃঃ বর্মিগণ আসাম সীমান্তে ব্রিটিশ-অধিকৃত বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করে। ফলে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৮২৭ খৃঃ)। এই যুদ্ধে বর্মিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। ইয়ান্দাবুর সন্ধি (১৮২৬ খৃঃ) অনুযায়ী ব্রহ্মরাজ কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া ও অহোমরাজ্যের উপর সকল দাবি পরিত্যাগ করিলেন; আরাকান এবং টেনাসেরিম প্রদেশ দুইটি কোম্পানীকে প্রদান করিলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক কোটি টাকা প্রদান করিতে এবং রাজসভায় একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখিতে সম্মত হইলেন।

বিভিন্ন রাজ্য অধিকার ঃ লর্ড আমহার্স্টের সময় ভরতপুর ইংরেজরা অধিকার করিয়া লয়। লর্ড বেণ্টিংকের সময় কাছাড়, কুর্গ ও জয়ন্তিয়া রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। বেণ্টিংক রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন এবং সিন্ধুর আমীরগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

আফগান যুদ্ধ ঃ লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় আফগানিস্থানে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইংলণ্ড ভীত হইয়া-

ছিল। ইংরেজদের ধারণা ছিল হিরাট ও কান্দাহারের মধ্য দিয়া রাশিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে। লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। রঞ্জিৎ সিংহের নিকট হইতে পেশোয়ার পুনরধিকারের উদ্দেশ্যে দোস্ত মহম্মদ রাশিয়ার সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভীত অকল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে বিতাড়িত করিয়া শাহসুজাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ শাহসুজা, রঞ্জিৎসিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে এক ত্রিদলীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পর ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ও শিখ সৈন্যবাহিনী আফগানিস্থানে প্রবেশ করিয়া কান্দাহার ও গজনী অধিকার করিল। দোস্ত মহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় নির্বাসিত করা হইল ও বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিতে আফগানগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃঃ আফগানগণ বিদ্রোহী হয় এবং ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হয়। এই সময় লর্ড এলেনবরা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি নূতন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আফগানরা পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কাবুল ও কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। দোস্ত মহম্মদকে মুক্তিদান করা হয় এবং তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধ

সিন্ধু বিজয়ঃ লর্ড অকল্যাণ্ড সিন্ধুদেশে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৮৫৮ খৃঃ তিনি সিন্ধুর আমীরদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ঐ বৎসরই শাহসুজা এক চুক্তির দ্বারা সিন্ধুর উপর তাঁহার অধিকার পরিত্যাগ করেন। ১৮৩৯ খৃঃ আমীরদের এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হয়। ফলে সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ রক্ষণাধীনে আসিল। ইহার পর পুনরায় আর একটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া আমীরদের রাজ্যের একাংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় এবং তাহাদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহাতে ক্ষুব্ধ 'আমীরদের' সহিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আমীরগণ পরাজিত হন। তাঁহাদের নির্বাসিত করা হয় এবং সিন্ধু ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

শিখ যুদ্ধ (Sikh War)ঃ ১৮৪৫ খৃঃ প্রথম শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় শিখ সেনাবাহিনী রাজ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। রঞ্জিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র ছয় বৎসর বয়স্ক দলীপ সিংহের অভিভাবকরূপে রাণী

ঝিন্দন শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী ছিল সর্বেসর্বা। ১৮৪৫ খৃঃ রাণী ঝিন্দনের নির্দেশে শিখ সৈন্য-বাহিনী শতদ্রু নদী অতিক্রম করিলে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। লর্ড হার্ডিঞ্জও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শিখ সৈন্যবাহিনী মুদকী, ফিরোজশা, আলিওয়াল এবং সোব্রাওএর যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হইয়া লাহোরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল (১৮৪৬ খৃঃ)। শিখগণ জলন্ধর দোয়াব ইংরেজদের প্রদান করিল এবং সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পনেরো লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিতে রাজী হইল। এই অর্থ প্রদানের ক্ষমতা শিখদের ছিল না। এইজন্য তাহারা কাশ্মীর, জম্মুর ডোগরা নেতা গুলাব সিংহের নিকট দশ লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রয় করিল। স্যার হেনরী লরেন্স লাহোরের ইংরেজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইল। পরে আর একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার সর্ত অনুযায়ী আটজন শিখ সর্দারকে লইয়া গঠিত একটি অভিভাবক পরিষদের উপর শিখরাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করা হইল।

প্রথম শিখ যুদ্ধ

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। রাণী ঝিন্দনকে ইংরেজরা চুনার দুর্গে নির্বাসিত করিলে শিখগণ ক্রুদ্ধ হয়। মূলতাদের শিখ শাসনকর্তা মূলরাজ ইংরেজদের কার্যকলাপে ক্ষুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী হন এবং দুইজন ইংরেজকে হত্যা করে। বিদ্রোহ ব্যাপক আকার দেখা দিলে ডালহৌসী যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে হাজারার শাসনকর্তা ছাত্তার সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র শের সিংহ ছিলেন শিখ সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ক। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মূলরাজকে দমন করিবার জন্য শের সিংহকে প্রেরণ করেন। কিন্তু শের সিংহ বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন। ফলে যুদ্ধ সুরু হয়। মূলরাজ পরাজিত ও বিতাড়িত হন। শিখ সৈন্যবাহিনী চিলিয়ানওয়ালা এবং গুজরাটের যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। মূলতান ইংরেজ সৈন্যবাহিনী অধিকার করিল। ছাত্তার সিংহ এবং শের সিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন। পরাজিত শিখ সৈন্যবাহিনী অস্ত্র ত্যাগ করিল। ১৮৪৯ খৃঃ এক রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা পাঞ্জাব ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। দলীপ সিংহকে বার্ষিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল এবং শিখ সৈন্য-বাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া হইল। আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। পাঞ্জাবের শাসনভার প্রথমে তিনজন কমিশনার এবং পরে একজন চীফ কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত করা হইল।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ

পাঞ্জাব ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত

লর্ড ডালহৌসীর নীতি ও কার্যকলাপ : লর্ড ডালহৌসীর সময় পাঞ্জাব এবং বিভিন্ন রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিরোধ লইয়া দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী রেঙ্গুনের বন্দর অবরোধ করিলে এবং ব্রহ্মরাজের একখানি জাহাজ আটক করিলে বর্মিগণ ইংরেজ রণতরীর উপর গুলীবর্ষণ করে। ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বর্মিগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। প্রোম এবং পেগু ইংরেজ সৈন্যবাহিনী অধিকার করে। কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল না। এক রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা পেগু বা দক্ষিণ ব্রহ্ম ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল।

ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) প্রবর্তন করেন। এই নীতির অর্থ হইল এই যে, অধীন রাজ্যগুলি বা ইংরেজগণ কর্তৃক সৃষ্ট রাজ্যগুলির রাজা বা নবাবের মৃত্যু হইলে তাঁহার যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহা হইলে ঐ রাজ্যগুলি ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে। দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকারের অধিকার ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করিবেন না। ডালহৌসী ছিলেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। এই নীতি প্রয়োগ করিয়া তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সংহতি স্থাপন এবং দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা বাতিল করিয়া ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দত্তকপুত্র গ্রহণের নীতি বাতিল করায় তাহা হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা ও ধর্মমতকে আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার স্বত্ববিলোপ নীতির কঠোর প্রয়োগের ফলে সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল।

স্বত্ববিলোপ নীতি

স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া ডালহৌসী সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসী, সম্বলপুর, ভগত ও যোধপুর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কয়েকটি রাজ্যের শাসকের পদ বিলুপ্ত করা হইল ও ভূতপূর্ব শাসকদের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভূতপূর্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র ধুন্ধুপন্থের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই ধুন্ধুপন্থই, নানাসাহেব নামে ঝাঁসীর রাণী এবং অন্যান্যদের সহিত সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঞ্জোরের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে রাজপদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কর্ণাটকের নবাবের মৃত্যু হইলে কোন উত্তরাধিকারীকে স্বীকার করা হইল না। সিকিম রাজ্যের একাংশ, বেরার ১৮৫৬ খৃঃ কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল।

স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ ও প্রতিক্রিয়া

চতুর্দশ অধ্যায়

সংস্কার ঃ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

(Reforms : Social and Religious Movement)

হেস্টিংসের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ হেষ্টিংস কোম্পানীর কর্মচারী বা প্রতিনিধিদের দস্তক প্রদানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিলেন। কোম্পানীর ইংলণ্ডের পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে হেষ্টিংস দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটাইলেন। হেষ্টিংস বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জমিদারী চৌকি বা শুল্ক কেন্দ্রগুলি উঠাইয়া দেন। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, পাটনা এবং ঢাকা এই পাঁচটি স্থানে মাত্র শুল্ক ঘাঁটি রহিল। লবণ, তামাক এবং সুপারির উপর কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার রহিল। অন্যান্য দ্রব্যের শতকরা আড়াই টাকা হারে শুল্ক ধার্য হইল।

দ্বৈতশাসনের অবসান

কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্তের ফলে বাংলা ও বিহারের নায়েব দেওয়ানের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল। হেষ্টিংস বাংলার নবাবের বার্ষিক ভাতা কমাইয়া ষোল লক্ষ টাকা নির্ধারিত করিলেন।

সঠিক রাজস্ব নির্ধারণ এবং আদায়ের জন্য হেষ্টিংস ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি একটি ভ্রাম্যমান কমিটি গঠন করিলেন। পরে এই ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা কাউন্সিল ও ইহার সভাপতি একটি কমিটি বা রেভিনিউ বোর্ড গঠন করিলেন এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত শাসন-ব্যবস্থা ইহার অধীনে আনয়ন করা হইল। কোম্পানীর কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। প্রতি জেলায় রাজস্ব আদায়ের ভার সুপারভাইজার বা কালেক্টর নামধারী ইংরেজ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হইল। ১৭৭২ খৃঃ পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে কালেক্টরের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন জেলার রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব কাউন্সিলের দুইজন সদস্য এবং তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী লইয়া গঠিত রেভিনিউ বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাকে সাময়িকভাবে ছয়টি ডিভিসনে ভাগ করা হইল এবং প্রত্যেকটি ডিভিসনের জন্য একটি করিয়া প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন করা হইল।

রাজস্ব বিভাগের সংস্কার

১৭৭৭ খৃঃ হেষ্টিংস জমির পাঁচশালা বন্দোবস্তের পরিবর্তে বাৎসরিক বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। পরে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বিলুপ্ত করা হয়। রেভেনিউ কমিটির উপর রাজস্ব-বিভাগীয় ভার অর্পণ করা হয় এবং কালেক্টরদের পুনরায় নিয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে হেষ্টিংসের সংস্কারের ফলে রাজস্ব-বিভাগের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বিচার বিভাগের সংস্কার

প্রতি জেলায় একটি দেওয়ানী আদালত এবং একটি ফৌজদার আদালত স্থাপন করা হইল। দেওয়ানী আদালতের প্রধান ছিলেন কালেক্টর। ফৌজদারী আদালতে কাজী বা মুফ্‌তীর নির্দেশে বিচারকার্য সমাধা হইত। মফঃস্বলে আদালতের আপীল মীমাংসা করিবার জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত স্থাপন করা হইল। কাউন্সিলের সভাপতি (গভর্নর) কাউন্সিলের দুইজন সদস্যের দেওয়ানী আদালতের বিচারকার্য পরিচালনা (সাহায্য) করিতেন। ফৌজদারী আদালতের বিচারকার্য নবাব কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি পরিচালনা করিতেন। ইংরেজ বিচারকগণ ফৌজদারী আদালতের বিচারকার্যও পরিদর্শন করিতে পারিতেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার (Commercial Reforms of Lord Cornwallis) ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কোম্পানীর বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংস্কার সাধন করিলেন। পূর্বে বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের ভার এগারোজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি "বোর্ড অব ট্রেড" এর উপর ন্যস্ত ছিল। কর্ণওয়ালিস ইহার সদস্যসংখ্যা কমাইয়া পাঁচজন করেন। কোম্পানী পূর্বে পণ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য নিজ কর্মচারীদের সহিত চুক্তি করিত। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া কর্ণওয়ালিস বোর্ড কর্তৃক সরাসরি দালাল ও দেশী বণিকদের সহিত পণ্যদ্রব্য সরবরাহের চুক্তির ব্যবস্থা করিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার (Judical Reforms) ঃ কর্ণওয়ালিস বিচার-ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং নবাবের ফৌজদারী মামলার বিচার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁহারা কাজী এবং মুফতীর সহযোগিতায় বিচার করিতেন। ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য চারিটি ভ্রাম্যমান বিচারালয় স্থাপন করা হইল।

সদর নিজামত আদালত

তেইশটি জেলার আদালত এবং কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে চারিটি প্রাদেশিক আদালত দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য স্থাপন করা হইল। প্রাদেশিক আদালতগুলিতে তিনজন করিয়া ইংরেজ বিচারক নিযুক্ত হইলেন। দেওয়ানী মামলার সর্বোচ্চ হইল কলিকাতায় অবস্থিত সদর দেওয়ানী আদালত। গভর্ণর জেনারেল এবং কাউন্সিল ইহার বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। দেওয়ানী মামলার সর্বনিম্নে ছিল সদর আমিন এবং দেশী মুনসেফগণ। কালেক্টরদের হস্তে একমাত্র রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য ন্যস্ত হইল। এইভাবে শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থা পৃথক করা হইল।

চারিটি প্রদেশিক আদালত

সদর দেওয়ানী আদালত

পুলিশ-ব্যবস্থার সংস্কার (Reforms of Police System) ঃ দেশের শান্তি রক্ষার জন্য প্রতিটি জেলাকে কয়েকটি থানায় বিভক্ত করা হইল। প্রতি থানায় একজন করিয়া দারোগা নিযুক্ত হইল। থানায় শান্তি রক্ষার ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত করা হইল। ইহারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন হইলেন। পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষা করিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের ক্ষমতা বিনষ্ট হইল।

সিভিল সার্ভিস সংস্কার (Reforms of Civil Service) ঃ হেষ্টিংসের প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থায় নানাবিধ দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন ছিল খুবই কম, কিন্তু তাহারা কমিশন পাইত এবং ব্যক্তিগত অবৈধ বাণিজ্য করিয়া প্রভূত উপার্জন করিত। কর্ণওয়ালিস কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং কমিশন প্রদান ও অবৈধ ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। ১৭৯৩ খৃঃ চার্টার এ্যাক্টের দ্বারা শাসনকার্যে শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল। ফলে শাসনকার্যের বিভিন্ন পদ হইতে ভারতীয়দের বাদ দেওয়া আইনসিদ্ধ করা হইল। ভারতীয়দের শাসনকার্য হইতে বাদ দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। সামরিক বিভাগে সুবেদার পর্যন্ত এবং বেসামরিক বিভাগের সামান্য বেতনের বিচার ও রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ব্যতীত কোন উচ্চতর পদে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তথাপি কর্ণওয়ালিস কর্মচারীদের মধ্যে শৃংখলা এবং সততা আনয়ন করিয়া শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনিই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের গোড়া পত্তন করেন।

শাসনকার্যে শুধুমাত্র ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খৃঃ (Permanent Settlement)ঃ কর্ণওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৭৯৩ খৃঃ প্রধান মন্ত্রী পিট এবং বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতির সহিত একমত হইয়া তিনি দশ বৎসরের বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল। এই ব্যবস্থার দ্বারা বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার বিনিময়ে জমিদারদের জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইল। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা প্রদান না করিলে জমিদারী নিলাম করিবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হইল। কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল চিরস্থাশী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অনুগত শ্রেণীতে পরিণত কর। জমিদারদের জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে তাহারা জমির এবং কৃষি-কার্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে এবং ইহার ফলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি হইবে।

কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং ইহার ফলে বাংলাদেশ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং উন্নত প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। খাজনা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রজাগণ অত্যাচারমূলক এবং অস্থায়ী খাজনা প্রদানের হাত হইতে রক্ষা পাইল। ফলে তাহারাও কৃষিকার্যের প্রতি মনোযোগী হইল। রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়ায় বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবার সুবিধা হইল। এই ব্যবস্থার ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল।

গুণাবলী

কিন্তু এই ব্যবস্থায় বহুবিধ ত্রুটিও ছিল। প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদান না করিলে জমিদারী নীলাম করিবার নীতি গৃহীত হইবার ফলে প্রথম দিকে বহু জমিদারী নীলাম হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, জমিদারীর সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া না দেওয়ায় পরবর্তী কালে বিভিন্ন জমিদারের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, জমির উপর প্রজাদের সত্ব নির্ধারিত না হওয়ায় প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। পরে আইন করিয়া ইহাদের জমিদারদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, পরবর্তী কালে জমির উন্নতি হইলে এবং জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে, খাজনা নির্দিষ্ট থাকায় জমিদাররা লাভবান হইলেও সরকারের তাহাতে কোন লাভ হইল না। সম্ভবতঃ কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা জমিদারীর উন্নতির প্রতি

একাধিক ত্রুটি

লক্ষ্য রাখিবেন এবং প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু জমিদারগণ নায়েব গোমস্তাদের উপর জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া শহরে যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। উচ্ছৃংখল এবং অত্যাচারী নায়েব গোমস্তাদের হস্তে প্রজাদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। জমিদারী প্রথার এই সকল কুফলের জন্যই ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৫৪ খৃঃ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

প্রজাদের দুর্দশা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুত্ব ও ফলাফল : নিজের অগোচরেই লর্ড কর্ণওয়ালিস এমন এক ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়াছিলেন যাহা বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল। নূতন জমিদারি ব্যবস্থার সহিত পরিচয় না থাকায় বহু জমিদারী বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই নূতন বন্দোবস্তের ফলে "ভবিষ্যতে জমিদারশ্রেণী লাভবান হইল, প্রজাদের দাবি আপাততঃ উপেক্ষিত রহিল এবং সরকারের রাজস্ববৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইল।"

লর্ড বেন্টিংকের অর্থ নৈতিক সংস্কার (Financial Reforms) : প্রথম-ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, এইজন্য বেন্টিংক প্রথমে আর্থিক অবস্থা উন্নতির-বিধানে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সামরিক এবং বেসামরিক বিভাগে যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচ করিলেন। বেসামরিক বিভাগের কর্মচারীদের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইল এবং সামরিক বিভাগের 'অর্থভাতা' বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। মোটামুটিভাবে বেণ্টিংকের সংস্কারের ফলে ঘাটতি রাজস্ব বাড়তিতে পরিণত হইল।

ব্যয়সংকোচ; রাজস্ববৃদ্ধি

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (Administrative Reforms) : বেন্টিংক শাসনকার্যে প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রাদেশিক আপীল আদালত এবং ভ্রাম্যমান আদালতগুলি উঠাইয়া দেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে এবং নিম্ন আদালতের বিচারকপদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করিবার এবং উপযুক্ত বেতন দানের ব্যবস্থা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরদের কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য কমিশনার নামক নূতন এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হইল। শাসনকার্যে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তন করা হইল। এই সকল সংস্কারের ফলে শাসনকার্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল।

সামাজিক সংস্কার (Social Reforms) ঃ অর্থনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার অপেক্ষা সামাজিক সংস্কারের জন্য বেন্টিংক চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম কীর্তি হইতেছে 'ঠগী' দমন। ঠগী দস্যুগণ সংঘবদ্ধভাবে হত্যাকাণ্ড এবং লুণ্ঠন চালাইয়া আতংকের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ঠগী দলভুক্ত ছিল। ইহাদের দমন করিবার জন্য মেজর শ্লীম্যানকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি দুই বৎসরের মধ্যে ঠগীদের সম্পূর্ণভাবে দমন করেন।

ঠগী দমন

বেন্টিংকের অপর উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন (১৮২৯ খৃঃ)। বেন্টিংকের পূর্বে লর্ড ওয়েলেসলী সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকল্পে সদর নিজামত আদালতের মতামত চাহিলে বিচারকগণ সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। ১৮১৩ খৃঃ লর্ড মিন্টো এই সুপারিশের ভিত্তিতে সমস্ত বিচারকদের নিকট নির্দেশ প্রদান করেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশের বিনা অনুমতিতে এবং পুলিশের উপস্থিতি ব্যতীত কোন হিন্দু রমণীকে মৃত স্বামীর সহিত সহমৃতা করা চলিবে না। কিন্তু কার্যতঃ ইহাতে কোন ফল হয় নাই। লর্ড আমহার্স্ট ভারতবাসীদের ধর্মে আঘাত না করিবার উদ্দেশ্যে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু লর্ড বেন্টিংক সদর নিজামত আদালতের বিচারকদের এবং রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থনে ও সহযোগিতায় সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেন।

সতীদাহ প্রথার বিলোপ

শিক্ষা সংস্কার (Educational Reforms) ঃ রাজা রামমোহন রায়ের সমর্থনে বেন্টিংক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে উদ্যোগী হইলে বিতর্কের সৃষ্টি হইল। ঐতিহাসিক উইলসন এবং ব্রিটিশ সেক্রেটারী প্রিন্সেপ ভারতে ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও লর্ড মেকলে এবং রাজা রামমোহন রায়ের সমর্থনে বেন্টিংক ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে ভারতে দ্রুত পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, যদিও আরবী এবং সংস্কৃত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বেন্টিংকের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বে এলফিনস্টোন ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন

লর্ড ডালহৌসীর আভ্যন্তরীণ সংস্কার (Internal Reforms of Lord Dalhousie) ঃ শাসন সংস্কারে ডালহৌসী অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্যার জন লরেন্সকে চীফ কমিশনার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর পাঞ্জাবের শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। ব্রহ্মদেশে ইংরেজ-অধিকৃত পেগুর শাসনভার ভারত সরকারের অধীনে একজন কমিশনারের উপর অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য একজন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর নিয়োগ করা হয়।

শাসন সংস্কারক

সমাজ সংস্কারক হিসাবেও ডালহৌসী ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন পাশ করেন। ইহার ফলে হিন্দু বিধবাদের বিবাহ আইনসিদ্ধ হইয়াছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইতেছে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত না করা।

সমাজ সংস্কারক

ডালহৌসীর জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীও উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৪ খৃঃ তিনি 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট' বা 'জনহিতকর বিভাগ' সৃষ্টি করেন। মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে এই ধরনের বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। এই বিভাগ স্থাপন করিবার ফলে উন্নতিমূলক কার্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়। কৃষি এবং সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গঙ্গার খাল এবং বারিদোয়াব খাল খননের ব্যবস্থা করা হয়। ডালহৌসী প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি ডাক বিভাগের উন্নতি সাধন করেন এবং সারা ভারতের জন্য একই ধরনের দুই পয়সার ডাক টিকিটের প্রবর্তন করেন। ভারতে প্রথম রেলপথ তাহার সময়েই নির্মিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃঃ বোম্বে হইতে থানা এবং ১৮৫৪ খৃঃ কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়। তিনি বিখ্যাত গ্রাণ্ডট্রাংক রোড সংস্কার সাধন করেন।

রেলপথ ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তন

বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিক্ষাবিভাগ বা 'ডিপার্টমেণ্ট অব পাবলিক ইন্স্‌ট্রাকসন' গঠন করা হইল। এই বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য শিক্ষা-অধিকর্তা (ডিরেক্টর অব্‌ পাবলিক ইন্সট্রাকসন) নিযুক্ত করা হইল। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। ১৮৫৭ খৃঃ কলিকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডালহৌসী ভারতে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তক।

শিক্ষা সংস্কার

লর্ড রিপনের সংস্কার লর্ড বেন্টিংকের শাসনকালের ন্যায় লর্ড রিপনের শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লর্ড রিপন গ্লাডস্টোনের উদারনৈতিক মতের অনুগামী ছিলেন। বৈদেশিক নীতি অপেক্ষা দেশের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে তিনি অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। যে সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি ভারতীয়দের নিকট সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রিপন অবাধ বাণিজ্য-নীতির সমর্থক ছিলেন। তিনি আমদানি শুল্ক কমাইয়া দেন এবং লবণ-কর হ্রাস করেন। লর্ড রিপনের উদার-নৈতিক সংস্কারকার্যের মধ্যে দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রত্যাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই আইন বাতিল করিবার ফলে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার লাভ করে। ভারতে যাহাতে স্বাধীন-ভাবে শিক্ষা প্রসারলাভ করে, তাহার জন্য রিপন শিক্ষা-ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। শিক্ষা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য তিনি স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন অধিক সংখ্যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং বিদ্যালয়গুলির অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্যদানের সুপারিশ করে।

শুল্ক ও বাণিজ্য-নীতি

দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রত্যাহার

শিক্ষানীতি ; হাণ্টার কমিশন

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য রিপন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। রিপনের পূর্বেই কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি বৃহৎ সহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, খেয়াব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতির ভার স্থানীয় কমিটিগুলির উপর অর্পণ করা হইল। কিন্তু স্থানীয় কমিটিগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। রিপন ১৮৮৪ খৃঃ এক আইন পাশ করিয়া গ্রামাঞ্চলে পরবর্তী কালের জেলাবোর্ড, মহকুমা বোর্ডের ন্যায় 'তহশীল' বা তালুক বোর্ড গঠন করিবার ব্যবস্থা করেন। এই সকল বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবার পরিবর্তে করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। সহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রসার

হইল। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সদস্যগণের একাংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হইল, কিন্তু সরকারের হস্তে পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের ভার রহিল। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের পশ্চাতে রিপনের উদ্দেশ্যে ছিল ভারতীয়দের শাসনকার্য পরিচালনায় উপযুক্ত করিয়া তোলা।

রায়ত ও শ্রমিকদের উন্নতিমূলক আইন

বাংলা এবং অযোধ্যার রায়তদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি একটি প্রজাসত্ব আইনের খসড়া তৈয়ারি করেন। তাঁহার পরবর্তী ভাইসরয় ডাফরিনের সময় ইহা আইনে পরিণত হইয়াছিল। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কারখানা আইন (ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট ১৮৮১ খৃঃ) পাশ করেন। ইহার ফলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের দৈনিক নয় ঘণ্টার অধিক কাজ করান নিষিদ্ধ হইল।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন

বিচার-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তাহা দূর করিবার জন্য ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইনসদস্য সি পি ইলবার্ট একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। পূর্বে কেবলমাত্র ইংরেজ বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণের দ্বারাই ইংরেজ নাগরিকদের বিচার করা হইত; ইউরোপীয়দের বিচার করিবার ক্ষমতা ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের ছিল না। কিন্তু ইলবার্ট বিলের দ্বারা এই বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা করা হইল। ভারতীয় বিচারকদের ও ম্যাজিস্ট্রেদের ইউরোপীয়দের বিচার করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইল। কিন্তু এই অত্যন্ত সঙ্গত আইনের বিরুদ্ধে ভারতে ইউরোপীয় সমাজ তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিল। ভারতীয় বিচারকগণ কর্তৃক বিচার হওয়া তাহারা অপমানজনক বলিয়া মনে করিল। অবশেষে লর্ড রিপন আপোষ-মীমাংসা করিতে বাধ্য হইলেন। ভারতীয় বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ কোন ইউরোপীয়কে বিচার করিতে পারিবেন, কিন্তু অপরাধী ইচ্ছা করিলে জুরীর দ্বারা বিচারের দাবী করিতে পারিবে এবং জুরীর সদস্যগণের অর্ধেক অবশ্যই ইউরোপীয় হইবেন। ইলবার্ট বিলের মূল উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হইলেও শিক্ষিত ভারতীয়গণ উপলব্ধি করিল যে, সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে দাবি আদায় করা সম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ (Renaissance in the Nineteenth Century): উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং

রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসিল। ঊনবিংশ শতাব্দী হইল রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। এই রেনেসাঁসের অগ্রদূত হইল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ (১৭৫৭-৫৮ খৃঃ) ভারতের ইতিহাসে একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতের সামাজিক এবং ধর্মীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। ইহার ফলে ভারত মধ্যযুগ হইতে বর্তমান যুগে প্রবেশ করিল।

রেনেসাঁসের কেন্দ্র বাংলা

ভারতের সামাজিক এবং ধর্মীয় চিন্তাধারার পরিবর্তনের মূলে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতাকে বাংলাদেশেই প্রথম আগ্রহভরে গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ এবং তাহার ধারক ও বাহক ছিল বাঙ্গালী জাতি।

বেন্টিংকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রসার

বেন্টিংকের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ শাসকগণ ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভারতীয়গণকে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার উৎসাহে স্যার উইলিয়ম জোন্স "রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জোনাথান ডানকান বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বেন্টিংকের সময় হইতে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করে। অবশ্য ইহার পূর্বেই খৃষ্টান মিশনারিগণ ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন রায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ভারতে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করিল, তখনই ভারতীয় সভ্যতার সহিত ইউরোপীয় সভ্যতার সমন্বয়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিল। এই যুগসন্ধিক্ষণে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটিল। বস্তুতঃ রামমোহন রায়ই নব ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। তাঁহারই প্রচেষ্টা এবং আন্দোলনের ফলে ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যাপক প্রচলনের স্থচনা হইল। ভারতীয়দের ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের মূলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন। তিনি সরকারের নিকট ভারতে পাশ্চাত্যের ন্যায় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুরোধ জানাইলেন

এবং আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃতের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপের প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহনের দাবি অনুযায়ী ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে নাই।

কিন্তু সরকার রামমোহনের দাবি অগ্রাহ্য করিলেও প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজ ডেভিড হেয়ার এবং রামমোহনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৮১৭ খৃঃ কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই হিন্দু কলেজই পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম গ্রহণ করিয়াছে। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনে ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় কলিকাতা ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। আলেকজাণ্ডার ডাফ নামক আর একজন ইংরেজের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রামমোহনের সাহায্যে এবং সমর্থনে তিনি কলিকাতায় জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতেই পরবর্তীকালে স্কটিশচার্চ কলেজের জন্ম হয়।

ডেভিড হেয়ার, আলেকজাণ্ডার ডাফ

বাংলাদেশের তথা ভারতের নবজাগরণের মূলে যে কয়জন মহানুভব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হয় তাহার মধ্যে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক এবং লর্ড মেকলের নাম উল্লেখযোগ্য। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বেণ্টিংক ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ১৮২৯ খৃঃ তিনি সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করেন। বেণ্টিংক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সমর্থক ছিলেন কিন্তু সরকারের সেক্রেটারী প্রিন্সেপ তাঁহার তীব্র বিরোধিতা করেন। লর্ড মেকলে এবং রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতায় তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কলিকাতায় 'মেডিকেল কলেজ' এবং বোম্বে 'এলফিনস্টোন ইনষ্টিটিউট' স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড মেকলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একদল "ভারতীয় ইংরেজ" তৈয়ারী করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রচারে তিনি সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন।

বেণ্টিংক ও মেকলে

রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, বেণ্টিংক, ডাফ এবং মেকলে বাংলায় যে রেনেসাঁসের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই রেনেসাঁস হইতেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছিল; এই রেনেসাঁসের মধ্য হইতেই জন্ম হইয়াছিল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ, সমাজের অবহেলিত জনসাধারণের উন্নতি বিধান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁহার অন্তহীন প্রচেষ্টার মধ্যে

পাশ্চাত্যের উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের প্রভাবে সৃষ্টি হইল মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র এবং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' জাতীয়তাবাদের বাণী বহন করিয়া আনিল। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সারা ভারত উদ্বেল হইয়া উঠিল। অন্যান্য যে সকল মনীষী রেনেসাঁসের যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রেনেসাঁস

সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন: ঊনবিংশ শতকে ভারতে যে নব-জাগরণ হইয়াছিল তাহা ভারতের জনসাধারণের চিরাচরিত সংস্কার এবং রক্ষণ-শীলতার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী অনুসন্ধানী দৃষ্টি এবং যুক্তির দ্বারা সব কিছু বিচার করিতে শিখিল। নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা শাস্ত্রবিধি এবং ধর্মের অনুশাসনের ব্যাখ্যা করা হইল। ফলে সারা ভারতব্যাপী প্রগতিশীল ধর্মীয় আন্দোলন সুরু হইল।

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭১-১৮৩৩ খৃঃ (Raja Rammohan Roy): পূর্বেই বলা হইয়াছে রাজা রামমোহন ছিলেন ভারতে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অগ্রদূত। রামমোহন ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান। তাঁহাকে ভারতের "প্রথম আধুনিক মানুষ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর অধীনে সাধারণ চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া পরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রামমোহনের দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল মানবধর্মী। তিনি ধর্মসংস্কারের জন্য আন্দোলন সুরু করিয়া-ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। রামমোহন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, একেশ্বরবাদই হইল সকল ধর্মের মূলকথা। রামমোহন ঘোষণা করিলেন যে, পৌত্তলিকতাবাদ হিন্দুধর্মের মূলকথা নহে। আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান একেবারেই মূল্যহীন। ধর্মীয় কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতা হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি হিন্দু ধর্ম এবং সমাজের

রেনেসাঁসের অগ্রদূত

সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ সংস্কারে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে রামমোহন ছিলেন বেণ্টিংকের উগ্র সমর্থক। অস্পৃশ্যতা এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন। রামমোহন জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনে এবং স্ত্রী-জাতির সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য তাঁহার আন্দোলন বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহারই সমর্থন এবং সহযোগিতার ফলে বেণ্টিংকের পক্ষে সামাজিক সংস্কারগুলি প্রবর্তন করা সম্ভব হইয়াছিল।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা

ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় তিনি কলিকাতায় ১৮১৭ খৃঃ হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত হইয়াছে। তাঁহার সমর্থনে বেণ্টিংক সরকারী অর্থ ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যয় করিতে থাকেন। লর্ড আমহার্স্ট কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইলে তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন এবং জানাইয়া দেন যে, ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন জানিতে অধিকতর উৎসাহী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান

১৮১৭ খৃঃ লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিলে তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতীয়দের জুরিপদে নিযুক্ত হইবার অধিকার ছিল না। রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি পার্লামেণ্টে অভিযোগপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগের দাবিতে ইংলণ্ডে গমন করিয়া বোর্ড অব কণ্ট্রোলের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। শাসনকার্যে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগের দাবী করেন এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রতিবাদ করেন। তিনি ফার্সীর পরিবর্তে সরকারী কার্যে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবভারতের রূপায়নে জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার জন্য ভারতের ইতিহাসে তিনি এক মহান আসনের অধিকারী হইয়াছেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে অবদান

ব্রাহ্ম-সমাজ (Brahmo Samaj) ঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আদর্শে উদ্বুদ্ধ রামমোহন হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার এবং জড়তা হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৮ খৃঃ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের অনুগামীরা মূর্তিপূজার বিরোধী এবং একেশ্বরবাদী। রামমোহন উপনিষদের সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের পিতা),

কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষিগণ ব্রাহ্ম-সমাজকে শক্তিশালী করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের কৃতিত্বে ব্রাহ্ম-সমাজ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে। স্ত্রী-জাতির অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্রাহ্ম-সমাজের আন্দোলন অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি নেতাদের মধ্যে বিরোধের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এই তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কেশবচন্দ্র সেন

প্রার্থনা সমাজ (Prarthana Samaj) ঃ ব্রাহ্ম-সমাজ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ১৮৬৭ খৃঃ কেশবচন্দ্র সেন বোম্বে প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত বিচারপতি মাধব গোবিন্দ রাণাডে এবং স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর ইহার সদস্য হন। বিচারপতি রাণাডে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রার্থনা সমাজ পশ্চিম ভারতে সমাজ সংস্কারের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রার্থনা সমাজের প্রচেষ্টায় শিশু সদন, অনাথ আশ্রম, বিধবা আশ্রম প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিচারপতি রাণাডে। দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতির (ডেকান এডুকেশন সোসাইটি) তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং উৎসাহী সদস্য ছিলেন। প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

বিচারপতি রাণাডে ও
আর. জি. ভাণ্ডারকর

আর্য সমাজ (Aryya Samaj) ঃ ১৮৭৫ খৃঃ দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক যুগের পবিত্র হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচার করা। তিনি বেদে বিশ্বাসী ছিলেন, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করিতেন না। আর্য সমাজ নানাভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করে। দয়ানন্দ প্রবর্তিত ধর্ম আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল শুদ্ধি আন্দোলন—অর্থাৎ অহিন্দুদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করা। তিনি জাতিভেদ প্রথা ও বাল্যবিবাহের কঠোর নিন্দা করিতেন। দয়ানন্দ বিধবা বিবাহ এবং নারী শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ দান করিতেন। দয়ানন্দের প্রচেষ্টায় আর্যসমাজ পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ধর্মীয় এবং সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দয়ানন্দ সরস্বতী

রামকৃষ্ণ মিশন (Ramkrishna Mission) ঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী কেন্দ্র করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। রামকৃষ্ণদেব প্রথম জীবনে ছিলেন একজন দরিদ্র পুরোহিত। কলিকাতার নিকটে দক্ষিণেশ্বরে তিনি কঠোর সাধনায় মগ্ন হন এবং পরিশেষে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। সরল, অনাড়ম্বর এবং নিরহঙ্কারী রামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিখ্যাত মনীষী ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন "অশিক্ষিত রামকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন।" রামকৃষ্ণ সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাস করিতেন এবং উপমা ও আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মের মূল কথা এক। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা একই ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের পদ্ধতি এবং পথই কেবলমাত্র আলাদা। তিনি অতি আধুনিকতা এবং ধর্মান্ধতা উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশে এবং বাঙালী জাতি রামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী প্রচার করিবার জন্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং অনুগামী স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। বিবেকানন্দ ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি এবং সুবক্তা। তিনি ভারতের ধর্মজীবনের সহিত পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল শিক্ষার সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িত জনসাধারণের উন্নতির জন্য সারা জীবন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল, মুচি, মেথর সবাইকে তিনি ভাই বলিতেন। মানবধর্মী এক বিরাট মনের অধিকারী বিবেকানন্দ দেশবাসীর কল্যাণের জন্য স্কুল, কলেজ হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায়, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান প্রভৃতি জনকল্যাণ-মূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের প্রচারের বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দুধর্ম ও মাতৃভূমির সভ্যতা এবং গৌরব জগৎসভায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বেদান্তের আদর্শ নির্ভীক ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতের তরুণ সমাজ এবং ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মাবলম্বীরা তাঁহার উদ্দীপনাময় বক্তৃতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে দেশবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সৃষ্টি হয় ভারতবাসীর মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস এবং প্রেরণা সৃষ্টিই বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ১৮৯৪ খৃঃ চিকাগোর বিশ্ব-

ধর্মসভায় তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতার ফলে হিন্দু ধর্ম এবং সভ্যতা বিশ্ববাসীর অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বিশ্বসভায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম দূত

বিবেকানন্দের অবদান

হইলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভার ফলে ভারতের বাহিরে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা এবং জাতি হিসাবে ভারতের দাবি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল।

থিওসোফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society)ঃ ভারতে থিওসোফিক্যাল আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন মাদাম এইস. পি. ব্লাভটস্কি নামক জনৈক রুশ মহিলা এবং কর্ণেল এইস. এস. অলকট নামক একজন আমেরিকান সামরিক কর্মচারী। ১৮৭৯ খৃঃ আর্যসমাজের আমন্ত্রণে তাঁহারা ভারতে আসেন এবং মাদ্রাজের নিকট আদার নামক স্থানে থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

এ্যানি বেশান্ত

করেন। ১৮৯৩ খৃঃ ভারত দরদী ইংরেজ মহিলা মিসেস এ্যানি বেশান্ত ভারতে আগমন করেন এবং সোসাইটিতে যোগদান করেন। তিনি ভারতের প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেনারসে সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। এই হিন্দু স্কুল পরে কলেজ এবং পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

মুসলিম রাজনীতির ধারা (Trend of Muslim Politics)ঃ ভারতে যখন জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইতেছিল এবং ভারতের অগণিত জনসাধারণ যখন ধীরে ধীরে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন মুসলমানগণ এই আন্দোলনে যোগদান করে নাই। কংগ্রেস অধিবেশনে কিছু মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান করিতেন এবং কংগ্রেস সভাপতিপদে কয়েকজন মুসলমানও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে তাঁহারা কংগ্রেসের

ইংরেজ শাসনের প্রতি মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব

পতাকাতলে সমবেত হন নাই। বৃটিশ শক্তি বিস্তৃত হইবার ফলে ভারতে মুসলমান শাসনের অবসান হইয়াছিল। মুসলমানগণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। গোঁড়া মুসলমানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ইসলামবিরোধী বলিয়া মনে করিত। এইজন্য

পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন

তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিতে লাগিল এবং মুসলমানগণ অবহেলিত এবং দুর্দশাগ্রস্ত ও হতাশ হইয়া পড়িল।

কিন্তু যিনি মুসলমানদের এই হতাশা ও পতনের মধ্য হইতে পুনরায় গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তিনি হইলেন বিখ্যাত মুসলমান নেতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান। সৈয়দ আহম্মদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধান করিতে হইলে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন এবং সহানুভূতি অর্জন করিতে হইবে। এইজন্য তিনি ১৮৭৫ খৃঃ আলিগড়ে মহমেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই কলেজই পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই কলেজ যে শুধু মাত্র মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিত তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যবোধ জাগরিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের নূতন চিন্তাধারাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক বলিয়া মনে করিল এবং আলিগড় আন্দোলনকে (Aligarh Movement) পৃষ্ঠপোষকতা করিল। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োডর বেক প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে সৈয়দ আহম্মদ ভারতে মুসলিম আন্দোলন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীকরূপে পরিগণিত হইলেন।

আলিগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ নিজে এবং তাঁহার ধর্মাবলম্বীদের কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী ভারতে কোন প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠিত হইলে মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হইবে। কারণ তাহারা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করিবে। সৈয়দ আহম্মদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা না করিয়া তাহাদিগের সহযোগিতা করিয়াই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব। তিনি নিঃসন্দেহে মুসলমান সম্প্রদায়কে নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দ্বারা শাসিত হইবার যে ভীতি ও আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলেন৹দীর্ঘদিন পরে মহম্মদ আলি জিন্না তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের উস্কানি এবং সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানগণ প্রথমে পৃথক নির্বাচন এবং পরে পাকিস্তান গঠনের দাবী করিয়াছিল।

সৈয়দ আহম্মদের কংগ্রেস বিরোধিতার কারণ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় বিদ্রোহ

(Indian Mutiny)

১৮৫৭'র বিদ্রোহের কারণ (Causes of the Revolt of 1857) ঃ বিশেষ কোন কারণে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই। একাধিক ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক কারণে সারা ভারতব্যাপী বিদ্রোহের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ববিলোপ নীতি উল্লেখযোগ্য। ডালহৌসী মুঘল সম্রাটকে তাঁহার প্রাসাদ হইতে অন্যত্র সরাইয়া দিবার প্রস্তাব করায় মুসলমান জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি

অযোধ্যাকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার ফলে এবং ভূতপূর্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ও নৃপতি-গণ ইংরেজদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭-র পূর্ব হইতেই এই সকল অসন্তুষ্ট নৃপতিগণ ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অযোধ্যার ভূতপূর্ব নবাব, নানাসাহেব, নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও-সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, আজিমুল্লাখান, ঝাঁসীর রাণী, বিহারের অন্তর্গত জগদীশপুরের রাজপুত সর্দার কুনোয়ার সিংহ এবং মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের এক আত্মীয় ফিরোজ শাহের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ, স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার ফলে এই সকল রাজ্যের সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারিগণ বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামরিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিত্তশালী তালুকদারগণ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। ফলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্য-গুলির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী ও তালুকদারদের অসন্তোষ

অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে কর্মচ্যুত সৈনিকগণের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বেকার অভিজাতগণ এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্ম-চারিগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া-ছিল। অযোধ্যা রাজনৈতিক চক্রান্ত ও দলাদলির ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বিদ্রোহ অযোধ্যায় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দ্রুত পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসারলাভ করিবার ফলে এক শ্রেণীর ভারতবাসীর মনে আতংকের সৃষ্টি হইয়াছিল। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারী অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ এবং শিশুহত্যা নিবারণ, হিন্দুধর্ম-ত্যাগী খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারীদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বীকার, বিধবা বিবাহের জন্য আইন প্রণয়ন এবং খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের ফলে রক্ষণশীল ভারতীয় জনসাধারণ আতংকিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহারা ইংরেজ শাসনের অবসান কামনা করিতেছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারে ভারতবাসীর আতংক

চতুর্থতঃ, সামরিক বিভাগে শৃংখলা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর সুদক্ষ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই বেসামরিক কার্যে নিয়োগ করা হইত। ফলে সৈন্যবাহিনীতে সুদক্ষ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অভাব হইয়াছিল। পদোন্নতির ক্ষেত্রে একমাত্র প্রবীণত্ব (Seniority) বিবেচিত হইত। উচ্চপদগুলিতে অনেক অযোগ্য ইউরোপীয়দের নিয়োগ করিবার ফলে যোগ্য ভারতীয়দের পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হইবার ফলে ভারতীয় সিপাহীদের দূর দেশে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইত। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা বা ভিন্ন দেশে যুদ্ধ করিতে যাইয়া জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে তাহারা ইহা অপছন্দ করিত। তাহাদের অতিরিক্ত ভাতার দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। লর্ড ক্যানিং যখন আইন করিলেন যে প্রয়োজন হইলে যে কোন স্থানে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে তখন সিপাহীদের অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল। বেঙ্গল আর্মির সৈন্যগণ ছিল সাধারণতঃ উত্তর প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। তাহারা সমুদ্রযাত্রা বা কোন প্রকার নীচ কার্য করিতে চাহিত না।

সামরিক বিভাগে বিশৃংখলা ও অসন্তোষ

সিপাহীদের ঐ সকল অসন্তোষ হয়ত প্রশমিত করা সম্ভব হইত যদি সৈন্য-বাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য থাকিত। ডালহৌসী যখন ভারত ত্যাগ করিয়া যান তখন সৈন্যবাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল ৪৫,৩২২ এবং ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল ২,৩৩,০০০। ইউরোপীয়দের এই সংখ্যাল্পতার জন্য এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ড ব্যস্ত থাকিবার ফলে সিপাহীরা ইংরেজ শাসনকে ধ্বংস করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল।

সিপাহীদের সংখ্যাধিক্য

পঞ্চমতঃ, সিপাহীদের ইংরেজবিরোধী মনোভাব যখন এইভাবে ধূমায়িত হইতেছিল তখন চর্বি-মিশ্রিত কার্তুজ প্রবর্তনের ফলে তাহাদের বিক্ষোভ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। চর্বি-মিশ্রিত কার্তুজ দাঁতে কাটিয়া এনফিল্ড রাইফেলে ব্যবহার করিতে হইত। সিপাহীদের ধারণা হইল গরু ও শূকরের চর্বি-মিশ্রিত কার্তুজ প্রবর্তন করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ধর্ম নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট সিপাহীদের এই ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। সিপাহীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

এনফিল্ড রাইফেল ও নূতন কার্তুজ

বিদ্রোহের বিস্তার ও দমন (Spread and Suppression of the Revolt)ঃ ১৮৫৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশের বহরমপুরে প্রথম বিদ্রোহ স্থরু হয়। মার্চ মাসে কলিকাতার নিকটে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহী একজন ইউরোপীয় কর্মচারীকে গুলি করে। ইহার পর সমগ্র দেশে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইল। এই দুইটি স্থানে বিদ্রোহ সঙ্গে সঙ্গে দমন করা হয়। মীরাটে সিপাহীগণ চর্বি-মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলে পঁচাশিজন সিপাহীকে দুইবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহার ফলে তিন রেজিমেণ্ট সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহারা জেলখানা ভাঙ্গিয়া বন্দী সিপাহীদের মুক্ত করিয়া দিল। পরদিন তাহারা দিল্লী অধিকার করিয়া মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসাইয়া ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীদের এই বিরাট সাফল্যে বেরিলী, কানপুর, আগ্রা, ঝান্সী, মধ্যভারত, লক্ষ্ণৌ, বুন্দেলখণ্ড এবং অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অযোধ্যায় বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল। স্যার জন লরেন্সের কৃতিত্বের ফলে পাঞ্জাব শান্ত ছিল। শিখ সৈন্যগণ ইংরেজদের অনুগত ছিল।

মীরাট

দিল্লী

দিল্লী ইংরেজগণ শীঘ্রই পুনরধিকার করিল। প্রতিহিংসা-পরায়ণ ইউরোপীয়-দের হস্তে বহু নিরীহ নরনারী প্রাণ হারাইল। বাহাদুর শাহকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হইল। তাঁহার দুই পুত্র এবং এক পৌত্রকে হাডসন নামক একজন ইংরেজ সৈনিক গুলি করিয়া হত্যা করে। এইভাবে মুঘল বংশের বিলুপ্তি ঘটিল।

লক্ষ্ণৌতে স্যার হেনরী লরেন্স সিপাহীদের দ্বারা রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি সিপাহীদের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র

লক্ষ্ণৌ

সৈন্যদল সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে থাকে। অবশেষে আউটরাম এবং হ্যাভলক নূতন সৈন্যদল লইয়া লক্ষ্ণৌ উপনীত হইলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাঁহারা রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করিলেন! কিন্তু শক্তিশালী সিপাহীদের বিরুদ্ধে আউটরাম এবং হ্যাভলক সাফল্যলাভ করিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ খৃঃ মার্চ মাসে ইংরেজবাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার করিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীগণ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিল।

কানপুর

কানপুরে সিপাহীদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন নানা সাহেব। ব্রিটিশ সৈন্যগণ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। নানাসাহেব সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজদের এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিরাপদে এলাহাবাদে পৌছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু নৌকায় আরোহণের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সেনাপতি ক্যাম্পবেল কানপুর পুনরধিকার করিলেন। বেরিলীতে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইল এবং একজন রোহিলা নেতাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিল। প্রায় এক-বৎসর পর ক্যাম্পবেল বেরিলী পুনরধিকার করিলেন (১৮৫৮ খৃঃ)।

মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ড

মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ডে সিপাহীদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন ঝাঁসীর রাণী এবং নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী। ইংরেজ সেনাপতি স্যার হ্যাগ রোজ ঝাঁসীর রাণীকে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সাহসী নেত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাণীর স্বামী অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ডালহৌসী ঝাঁসী সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। রোজ বিদ্রোহীদের নিকট হইতে ঝাঁসী এবং কাল্পি অধিকার করিলেন। রাণী এবং তাঁতিয়া টোপি গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া সিন্ধিয়াকে বিতাড়িত করিলেন। সিন্ধিয়া আগ্রায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি রোজ গোয়ালিয়র পুনরধিকার করিলেন। রাণী পুরুষের বেশে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁতিয়া টোপি ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। নানাসাহেব নেপালের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।

বিহারের আরা নামক স্থানে রাজপুত জমিদার কুনোয়ার সিংহ বিদ্রোহী হন। তিনি উত্তর প্রদেশ ও মধ্যভারতের বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত

যোগাযোগ স্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। রাজপুতানা এবং মাদ্রাজেও বিদ্রোহ বিস্তৃত হইয়াছিল কিন্তু গুরুতর আকার ধারণ করে নাই। পাঞ্জাব শান্ত ছিল এবং অধিকাংশ দেশীয় নৃপতিগণ ইংরেজদের সাহায্য করিয়াছিল। সংঘর্ষের সময়ে ইংরেজগণ এবং সিপাহীগণ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের পর ক্যানিং-এর উদারতার ফলে ইংরেজগণ আর নিষ্ঠুর কার্যে লিপ্ত হইতে পারে নাই। এইভাবে ১৮৫৭'র বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল।


ঝাঁসীর রাণী

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ (Causes of the Failure of the Mutiny) ঃ বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রথম কারণ হইল বিদ্রোহীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঐক্য না গড়িয়া উঠিবার ফলে বিদ্রোহীদের সংগঠন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সংহতি এবং সর্বভারতীয় আদর্শের অভাবে বিদ্রোহীদের সংগ্রাম বিফল হইয়াছিল। একদল চাহিয়াছিল সম্রাট বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে। কিন্তু নানাসাহেব মারাঠাশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য নিজেকে পেশোয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্রোহীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতার অভাব ছিল। একমাত্র ঝাঁসীর রাণী ব্যতীত আর কেহ দক্ষতা এবং নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। অপরপক্ষে ইংরেজদের মধ্যে লরেন্স, নিকলসন, হ্যাভলক, আউটরাম, নীল এবং এডওয়ার্ডের ন্যায় সুযোগ্য সেনাপতি ছিল। তৃতীয়তঃ, যদিও বিদ্রোহ প্রথমে ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল তথাপি এই বিদ্রোহ ছিল সীমাবদ্ধ। ভারতের প্রতিটি এলাকায় প্রসারলাভ করে নাই। মীরাট, দিল্লী, বুন্দেলকণ্ড, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, রোহিলাখণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল। চতুর্থতঃ, ইংরেজগণ অধিকাংশ দেশীয় নৃপতি এবং সামান্তগণের সাহায্য পাইয়াছিল। ঝাঁসীর রাণী, অযোধ্যায় বেগম এবং অন্যান্য

সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও ঐক্যের অভাব

সুযোগ্য নেতার অভাব

বিদ্রোহের সীমাবদ্ধতা ইংরেজদের অধিকাংশ দেশীয় নৃপতিদের সাহায্য লাভ

কয়েকজন ক্ষুদ্র নৃপতি এবং সামন্ত ব্যতীত কেহ বিদ্রোহে যোগ দান করে নাই। বরং হায়দ্রাবাদের মন্ত্রী সালার জঙ্গ, নেপালের জঙ্গ বাহাদুর, গোয়ালিয়রের মন্ত্রী দিনকর রাও এবং শিখগণ বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, দেশের অগণিত জনসাধারণ সিপাহীদের সাহায্য করে নাই এবং বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নাই। ষষ্ঠতঃ, ডাক ও তার বিভাগের উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব থাকায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে দ্রুত সংবাদ প্রদানে তাহাদের সুবিধা হইয়াছিল। সিপাহীগণ উন্নত ও বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহার প্রসারের ফলে তাহারা আতংকিত হইয়াছিল।

ইংরেজদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব

বিদ্রোহীদের উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের অভাব

সপ্তমতঃ, ইংরেজদের প্রচুর পরিমাণে উন্নত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। কিন্তু সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল নিকৃষ্ট ধরনের। যেমন ইংরেজদের ছিল টোটাবন্দুক এবং সিপাহীদের ছিল গাদাবন্দুক।

বিদ্রোহের প্রকৃতি (Nature of the Mutiny) : ১৮৫৭'র বিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জেমস্, আউটরাম, ফরেস্টার প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে ইহা ছিল জাতীয় বিদ্রোহ, কিন্তু জন কে, রবার্টস, সমসাময়িক ভারতীয় কর্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিগত ১৯৫৭ খৃঃ এই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ডাঃ সুরেন সেনের দুইখানি তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও গভীর সাদৃশ্যও রহিয়াছে। ১৮৫৭'র বিদ্রোহ কোন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘটিত হয় নাই। প্রথমে ইহা সম্পূর্ণভাবে সামরিক বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত, রাজ্যচ্যুত এবং অসন্তুষ্ট নৃপতিগণ ও অভিজাতশ্রেণী এবং ভূস্বামীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাতে যোগদান করায় বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি থাকিলেও ইহা সর্বভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে নাই।

সমগ্র ভারতের জনসাধারণের অধিকাংশ এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ বা সমর্থন করে নাই, একমাত্র অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডে ইহা ব্যাপক গণবিদ্রোহে রূপলাভ করিয়াছিল। দেশীয় নৃপতিগণের অধিকাংশ ইংরেজদের সাহায্য করিয়াছিল। তিনটি প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মাত্র একটি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে কোন ঐক্য বা দৃঢ় সংগঠন ছিল না। সুযোগ্য নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। বিদ্রোহী সিপাহীগণ যেমন নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল তেমনি ইংরেজগণও নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিয়াছিল।

সর্বভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহ নহে

বিদ্রোহের ফলাফল (Result of the Mutiny)ঃ স্যার লেপিল গ্রিফিন এই বিদ্রোহকে মঙ্গলময় ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই বিদ্রোহের ফলে বহু অনিশ্চয়তার অবসান হইয়াছিল এবং একটি বণিক সংস্থার হস্ত হইতে সরকারের হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত হইবার ফলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থার বহু গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

কোম্পানীর শাসনের অবসান

প্রথমতঃ, কোম্পানীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ ২রা আগস্ট পার্লামেণ্ট একটি আইন পাশ করিয়া (An Act for the Better Govt. of India) কোম্পানীর শাসনের অবসান করিল। এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত একজন ভারত-সচিব পনেরোজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। অবশ্য এই পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক মাত্র ছিল। কারণ কোম্পানীর ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে সরকারের হস্তগত হইয়াছিল এবং কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী পরামর্শদাতা সভায় পরিণত হইয়াছিলেন।

মহারাণীর ঘোষণা

১৮৫৮ খৃঃ ১লা নভেম্বর এলাহাবাদে এক দরবারে লর্ড ক্যানিং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে এক ঘোষণার দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত। এই ঘোষণাপত্রকে ভারতের জনসাধারণের ম্যাগ্‌নাকার্টা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ঘোষণাপত্রে কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিসমূহকে মানিয়া লওয়া হইল। ভারতীয় নৃপতিগণের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এবং অধিকার স্বীকার করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইল। ভারতীয় জনগণের প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা

হইবে না। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি পরিত্যক্ত হইল। ব্রিটিশ প্রজাদের হত্যাকার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য সকলকে ক্ষমা করা হইল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হইল।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

সৈন্যবাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। বিভক্ত ও বিভেদ নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক বাহিনীগুলিকে পৃথক করিয়া রাখা হইল।

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে নূতন নীতি

তৃতীয়তঃ, বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে নূতন নীতি গ্রহণ করিল। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হইল।

রাজনীতিতে চরমপন্থী-দের আবির্ভাব

চতুর্থতঃ, ৫৭'র বিদ্রোহের অপ্রত্যক্ষ ফল হইল ভারতীয় রাজনীতিতে চরম-পন্থীদের আবির্ভাব। বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া উভয়পক্ষ যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল তাহার ফলে এবং ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের জন্য এক শ্রেণীর ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হইল। ভারতে নিযুক্ত লণ্ডনের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতা রাসেল তাঁহার ডায়েরীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ৫৭'র বিদ্রোহের ফলে দুই জাতির মধ্যে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উপশম হইতে বহু বৎসর সময় লাগিবে। হয়ত বিশ্বাস ও আস্থার ভাব আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

পঞ্চমতঃ, এই বিদ্রোহের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান হইল এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হইল।

পরিশিষ্ট

১। **মৌর্য শাসনব্যবস্থা ঃ** সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সম্রাট, অমাত্য, মন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইত। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও আইন প্রণেতা। মৌর্য সম্রাটগণ ব্যক্তিগতভাবে শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি সকল সময় রাজকার্য পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। সম্রাটকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য কয়েক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। কৌটিল্যের বিবরণে মন্ত্রিন এবং অমাত্য এই দুই শ্রেণীর মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণে ইহাদের সচিব বা অমাত্য বলা হইয়াছে। মন্ত্রী ছাড়াও একটি মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্ত্রিগণ অপেক্ষা ইহাদের ক্ষমতা কম ছিল। শাসনব্যবস্থা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতি বিভাগের জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। ইহারা অধ্যক্ষ নামে পরিচিত ছিলেন। গ্রীক লেখকগণ ইহাদের ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুরোহিত, যুবরাজ এবং সেনাপতিও শাসনব্যবস্থায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। প্রতিবেদক নামক কর্মচারীগণ সম্রাটকে সাম্রাজ্যের সকল খবর সরবরাহ করিতেন। প্রদেশ বা নগরের শাসনভার মহামাত্র নামক কর্মচারীগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রদেশের শাসনভার 'কুমার' উপাধিধারী রাজপুত্রদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। স্বায়ত্ব শাসনশীল নগর ও গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের শাসনভার গ্রামিক নামক কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকিত। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি জেলা বা জনপদ গঠিত হইত। জনপদের শাসনভার 'সমাহারত্রি' নামক কর্মচারীর উপর অর্পিত হইত। কতকগুলি জনপদ লইয়া এক একটি প্রদেশ গঠিত হইত। রাজা ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চে। তিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি। মহামাত্র, রাজুক ও গ্রামিকগণ বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। অঙ্গচ্ছেদ, বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কর্মচারীদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে

সম্রাট

উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ

দণ্ডবিধি

'সমস্থা' ও 'সঞ্চরা' নামক দুইশ্রেণীর গুপ্তচরের উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হইত। বিশেষ প্রয়োজনে ইহা বাড়াইয়া এক-চতুর্থাংশ এবং কমাইয়া এক অষ্টমাংশ করা হইত। এই রাজস্বকে 'ভাগ, বলা হইত। ইহা ব্যতীত অঞ্চল বিশেষে রাজ-কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য 'বলি' নামক কর ধার্য করা হইত। ইহা ব্যতীত জন্ম মৃত্যু কর, বিক্রয় কর, বাণিজ্য শুল্ক, জল কর প্রভৃতি হইতে অনেক রাজস্ব আদায় হইত। ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদ রাজধানী পাটলীপুত্রের শাসনভার পরিচালনা করিত। পাঁচজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত ছয়টি সমিতিতে এই পরিষদ বিভক্ত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা, বিক্রীত দ্রব্যের উপর এক-দশমাংশ কর আদায় করা, নাগরিকের জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা প্রভৃতি বিশয়গুলি এক একটি সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল।

রাজস্ব

পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থা

মৌর্য সম্রাটগণের সামরিক বাহিনী খুব শক্তিশালী ছিল। সম্রাট ছিলেন সৈন্য-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সৈন্য বিভাগের একজন সেনাপতি থাকিত। ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিত। সৈন্য-বাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ, হস্তী, রসদ ও যানবাহন এবং নৌবাহিনী এই ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। এক একটি বিভাগের দায়িত্ব পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল।

সামরিক বিভাগ

অশোক শাসনব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। রাজুক, যুত মহামাত্র প্রভৃতি কর্মচারীগণকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করিতে হইত। জনসাধারণের উপর যাহাতে কোন অবিচার বা অত্যাচার না হয় তাহার প্রতি তাহারা লক্ষ্য রাখিত। তিনি ধর্মের অনুশাসনগুলি প্রচারের জন্য ধর্ম মহামাত্র নামক একশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অশোক প্রজাদের সন্তানতুল্য বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির জন্য তিনি সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অশোকের সংস্কার

২। **বিজয়নগর সাম্রাজ্য ঃ** মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে সর্বত্র যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সুযোগে ১৩৩৬ খৃঃ বিজয়নগর রাজ্যের সৃষ্টি হয়। সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহাদের মধ্যে হরিহর ও বুক্কা ছিলেন প্রধান। তিনটি বংশ বিজয়নগরে রাজত্ব করিয়াছিল, ইহার মধ্যে প্রথম হইল সঙ্গম

বংশ। এই বংশের শাসকগণ বহমনী রাজ্যের সহিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম হরিহর কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে কানাড়া, মহীশূর, ত্রিচিনোপল্লী, কাঞ্চী এবং চিংলেপুট বিজয় নগরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায় বহমনী সুলতানদের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।

সঙ্গমবংশ

দ্বিতীয় দেবরায়ের উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার ফলে বিজয় নগরে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। বহমনী সুলতান এবং উড়িষ্যার রাজা বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৪৮৬ খৃঃ রাজা দ্বিতীয় বিরূপাক্ষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সালুভ বংশীয় নরসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি সুদক্ষ এবং জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তিনি বহমনী সুলতান এবং উড়িষ্যার রাজা কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন। নরসিংহের পুত্রেরা দুর্বল শাসক ছিলেন। এই সুযোগে মন্ত্রী নরসা নায়ক সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ সালুভ বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বীর নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত বংশ তুলুভ বংশ নামে পরিচিত। নরসিংহের পর তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বহমনী সুলতান এবং উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করেন। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে দক্ষিণ কংকন, পূর্বে বিশাখাপট্টম এবং দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারত মহাসাগরে কয়েকটি দ্বীপের উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পর্তুগীজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পর্তুগীজ পর্যটক পেইজ কৃষ্ণদেব রায়ের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেব রায়েয় পর অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায় যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সদাশিব রায়ের রাজত্বকালে সকল ক্ষমতা মন্ত্রী রামরায় হস্তগত করেন। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুলতানগণের বিরোধে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু ১৫৬৫ খৃঃ বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের সুলতানগণের সম্মিলিত বাহিনী তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত বিধ্বস্ত করে। রামরায় ধৃত ও নিহত হন।

তালিকোটের যুদ্ধ

রামরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা তিরুমাল পেনুগোণ্ডায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি সদাশিবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ আরবিডু বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা তৃতীয় বঙ্গ ১৬৭২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ, অধীন হিন্দু-রাজগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

আরবিডু বংশ

৩। বহমনী রাজ্যঃ বিজয়নগরের ন্যায় বহমনী রাজ্যও মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে স্থাপিত হইয়াছিল। বিদেশী আমীরগণ শেখ ইসমাইল মূকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দেবগিরিতে এই রাজ্যের সূচনা করেন। শেখ ইসমাইল, হাসান নামক এক ব্যক্তির অনুকূলে পদত্যাগ করেন। হাসান ১৩৪৭ খৃঃ বহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকের পক্ষে বহমনী রাজ্য ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। ফিরোজ তুঘলকও দাক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। ফলে হাসান সহজেই তেলেঙ্গানা, দাবল, কোলাপুর এবং গোয়া অধিকার করেন। তিনি মালব ও গুজরাট অভিযান করেন। তাঁহার রাজ্য গুলবর্গা, বিদর, বেরার ও দৌলতাবাদ এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। হাসানের পরবর্তী সুলতান প্রথম মুহম্মদের রাজত্বকালে বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তিনি বরঙ্গলের রাজা কানাইয়া ও বিজয়নগররাজ প্রথম বুক্কাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। তাঁহার পর মুজাহিদ, দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ এবং ফিরোজ যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ বিজয়নগরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয় হরিহর ও দ্বিতীয় বুক্কাকে পরাজিত করিয়া অপমানজনক সর্তে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করে। কিন্তু ১৪২০ খৃঃ তিনি বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। ফিরোজের পর আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিজয়নগরের সৈন্য-বাহিনীকে পরাজিত করিয়া বিজয়নগর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করেন। আহম্মদ শাহ বরঙ্গল অধিকার করেন। তিনি বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং নির্মম ভাবে হিন্দুদের হত্যা করেন। ইহার পর আলাউদ্দিন আহম্মদের রাজত্বকালে পুনরায় বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিজয়নগররাজ দ্বিতীয় দেবরায় তাঁহার নিকট পরাজিত হন। আলাউদ্দিনের পুত্র হুমায়ুন ছিলেন একজন

হাসান

বিজয় নগরের সহিত সংগ্রাম

রক্তপিপাসু ও নিষ্ঠুর শাসক। ইহার পর যথাক্রমে নিজামশাহ, তৃতীয় মুহম্মদ শাহ এবং মামুদ শাহ ১৫১৮ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারা অযোগ্য ও দুর্বল ছিলেন। এই সময় মামুদ গাওয়ান নামক একজন বিদেশী মুসলমান শাসনকার্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দীর্ঘদিন তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন করিয়া তিনি বহমনী রাজ্যকে শক্তিশালী করেন। কিন্তু তাঁহার বিরোধীদের পরামর্শে সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। গাওয়ানের পতনের পর হইতে বহমনী রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। মামুদ শাহের (১৪৮২-১৫১৮) অকর্মণ্যতার ফলে যে বিশৃংখলা ও দলাদলি আরম্ভ হয় তাহার সুযোগে প্রাদেশিক শাসন-কর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বহমনী রাজ্য ভাঙ্গিয়া পাঁচটি সুলতানি রাজ্যের সৃষ্টি হইল—(১) বিজাপুর, (২) আহম্মদনগর, (৩) বেরার, (৪) গোলকুণ্ডা ও (৫) বিদর। মুঘল সম্রাটগণ পরবর্তীকালে এই রাজ্যগুলি জয় করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

মামুদ গাওয়ান

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

১। দেশ, জনসাধারণ ও ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব আলোচনা কর (Discuss the influence of geography on the country, its people and history)।

২। কয়টি শ্রেণীতে ভারতের জনসাধারণ বিভক্ত তাহা আলোচনা কর অথবা, ভারতের জনসাধারণকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। (What are the different races that constitute the Indian people)

৩। ভারতের মূলগত ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the fundamental unity of India)

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান কি কি ? (What are the different sources of ancient Indian history)

৫। ভারতের ইতিহাসের মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the various sources of the medieval and modern Indian history.)

তৃতীয় অধ্যায়

৬। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ইহার গুরুত্ব আলোচনা কর। (Give a brief account of the Indus valley Civilisation. Discuss its importance.)

৭। বৈদিক যুগের সভ্যতা সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (Write what you know about the civilisation of the Vedic Aryans.)

৮। বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও। (Give an account of the economic and social life in the vedic age.)

৯। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। বেদের গুরুত্ব কি ? (Briefly discuss the vedic liturature. What is the importance of the Vedas ?)

চতুর্থ অধ্যায়

১০। মহাবীরের জীবনী এবং তাঁহার ধর্মমত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a short account of the life and teachings of Mahavira)

১১। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও তাঁহার ধর্মমত আলোচনা কর। (Discuss the life and teachings of Gautama Buddha.)

১২। বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ কি কি? (What are the causes of the downfall of Buddhism ?)

পঞ্চম অধ্যায়

১৩। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের একটি বিবরণ দাও। (Give an account of Alexander's invasion of India.)

১৪। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর। (Discuss the results of Alexander's invasion of India.)

১৫। কুষাণ কাহারা ছিল? তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (Who were the Kushans ? Who was their greatest king ? Write what you know about him.)

১৬। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের ব্যাকট্রিয়, গ্রীক, শক ও পার্থিয় শাসকদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (Write what you know about the Bactrian Greek, Saka and Parthian ruler of North-Western and Western India.)

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৭। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Discuss the life and achievements of Chandragupta Maurya.)

১৮। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? (What were the measures adopted by Asoka for the propagation of Buddhism or Dharma ?

১৯ বিম্বিসার হইতে অশোক পর্যন্ত মগধের অভ্যুদয় ও বিস্তার আলোচনা কর। (Discuss the rise and expansion of the power of Magadha from Bimbisara to Asoka. ?)

২০। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তার আলোচনা কর এবং তাঁহার কৃতিত্বের বিবরণ দাও। (Discuss the conquests of Samudragupta and describe his achievements.)

২১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a brife account about Chandragupta II Vikramaditya.)

২২। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় আলোচনা কর। (Discuss the rise of Gupta empire from Chandragupta I to Skandagupta.)

২৩। হর্ষবর্ধনের জীবনী সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও এবং তাঁহার সামরিক, শাসনতান্ত্রিক, সাহিত্যিক ও ধর্মসংক্রান্ত কৃতিত্বের আলোচনা কর। (Sketch the career of Harshavardhana and describe his military, administrative, literary and religious achievements.)

২৪। গুর্জর প্রতিহারদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a short account about the Gurjara Pratiharas.)

২৫। বাংলাদেশের পালবংশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a brief account about the Pala dynasty of Bengal.)

২৬। শশাংক হইতে দেবপাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা কর। (Discuss the history of Bengal from Sasanka to Devapala.)

সপ্তম অধ্যায়

২৭। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a brief account of the society and culture in North and South India from 4th Century B. C to 14th Century A. D.)

অষ্টম অধ্যায়

২৮। ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (Write what you know about the expansion of Indian Culture and Civilisation beyond India.

নবম অধ্যায়

২৯। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ এবং তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে যাহা জান আলোচনা কর। (Discuss what you know about the Indian expeditions and achievements of Sultan Mahmud.)

৩০। মুহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের একটি বিবরণ দাও। (Give an account of the Indian expeditions of Mahamud Ghor.)

৩১। কুতুবউদ্দিন আইবকের জীবনী আলোচনা কর। (Sketch the career of Qutubuddin Aibak.)

৩২। ইলতুৎমিসের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Discuss the career and achievements of Iltutmish.)

৩৩। গিয়াসউদ্দিন বলবনের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Discuss the career and achievements of Ghiyusuddin Balban.)

৩৪। আলাউদ্দিন খল্‌জির জীবনী আলোচনা কর এবং বিজেতা এবং শাসক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব বিচার কর। (Sketch the career of Alauddin Khalji and make an estimate of him as a conqueror and as an adminstrator.)

৩৫। মুহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি আলোচনা কর এবং তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ কর। (Review the different projects of Muhammad Bin Tughlug and make an estimate of his character,)

৩৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(ক) মুবারক খল্‌জি, (খ) ফিরোজ তুঘলক। (Write short notes on (a) Mubarak Khalji, (b) Firuz Tuguluq.)

৩৭। শেরশাহের সহিত যুদ্ধের বিশেষ উল্লেখসহ হুমায়ুনের জীবনী আলোচনা কর। (Discuss the career of Humayun with special reference to his struggle with Sher Shah.)

৩৮। শেরশাহের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Sketch the career and achievements of Sher Shah.)

৩৯। আকবরের রাজ্যজয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a brief account of the conquests of Akbar.)

৪০। আকবরের ধর্মমত সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (Write what you know about Akbar's religious views.)

৪১। হিন্দুদের প্রতি এবং বিশেষভাবে রাজপুতদের প্রতি আকবরের নীতি আলোচনা কর। (Discuss Akbar's policy towards the Hindus and specially towards the Rajputs.)

৪২। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলী আলোচনা কর এবং তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ কর। (Discuss the main events in the reign of jahangir and review his character.)

৪৩। শাহজাহানের চরিত্র এবং কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Discuss the character and achievements of Sahajahan.)

৪৪। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি আলোচনা কর। (Discuss the Deccan policy of Aurangzeb.)

৪৫। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি আলোচনা কর। মুঘল সাম্রাজের পতনের জন্য তিনি কতখানি দায়ী ছিলেন। (Discuss the religious policy of Aurangzeb. How far he was responsible for the downfall of the Mughal Empire ?)

৪৬। শিখ, মারাঠা ও রাজপুতদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের নীতি আলোচনা কর। (Discuss Aurangzeb's policy towards the Sikhs, the Marathas and the Rajputs.)

দশম অধ্যায়

৪৭। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মুসলমান শাসনের প্রভাব আলোচনা কর। (Discuss the impact of Muhammedan rule on social and economic life of India.)

৪৮। মুসলমান শাসনের ফলে ভারতের শিল্প, ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্য কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা কর। (Discuss how Indian Art, Lanaguge, Religion and Literature were affected by Muslim rule.)

একাদশ অধ্যায়

৪৯। শিবাজীর জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Discuss the career and achievements of Shivaji.)

৫০। শম্ভুজী হইতে দ্বিতীয় বাজীরাও পর্যন্ত মারাঠাদের ইতিহাস আলোচনা কর। (Trace the history of the Marathas from Sambhuji to Baji Rao II.)

৫১। প্রথম তিনজন পেশোয়ার অধীনে মারাঠাদের ইতিহাস আলোচনা কর। (Discuss the history of the Marathas under the first three Peshwas.)

৫২। আকবর হইতে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত শিখদের প্রতি মুঘলনীতি আলোচনা কর। (Discuss the Mughal policy towards the Sikhs from Akbar to Aurangzeb.)

৫৩। রঞ্জিৎ সিংহের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Sketch the career and achievements of Ranjit Singh.)

দ্বাদশ অধ্যায়

৫৪। ভারতে যে সকল ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলি বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Describe briefly the history of the different European trading companies that came to India.)

৫৫। দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও। (Give an account of the Anglo-French struggle in the Deccan.)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৫৬। মীরজাফর ও মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক আলোচনা কর। (Review British relations with Mirjafar and Mirkasim.)

৫৭। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় ব্রিটিশ শক্তির বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the expansion of British power during the time of Warren Hastings.)

৫৮। হায়দার আলির জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Sketch the career and achievements of Haider Ali.)

৫৯। লর্ড ওয়েলেসলীর সময় ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তার আলোচনা কর। (Describe the expansion of British power in India under Lord Wellesley.)

৬০। লর্ড হেষ্টিংসের কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Discuss the achievements of Lord Hastings.)

৬১। টিপু স্লতানের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Sketch the career and achievements of Tipu Sultan.)

৬২। লর্ড ডালহৌসীর সময় ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তার আলোচনা কর। (Discuss the expansion of British power in India under Lord Dalhousie.)

চতুর্দশ অধ্যায়

৬৩। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সংস্কারগুলি আলোচনা কর। (Discuss the reforms of Warren Hastings.)

৬৪। লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিভিন্ন সংস্কারের বিবরণ দাও। (Give an account of the various reforms of Lord Cornwallis.)

৬৫। লর্ড বেণ্টিংকের বিভিন্ন সংস্কারের বিবরণ দাও। (Describe the various reforms of Lord Bentinck.)

৬৬। লর্ড রিপনের সংস্কারগুলির বিবরণ দাও। (Describe the reforms of Lord Ripon.)

৬৭। লর্ড ডালহৌসীর বিভিন্ন সংস্কার আলোচনা কর। (Discuss the various reforms of Lord Dalhausie.)

৬৮। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (Write what you know about Raja Rammohon Roy.)

৬৯। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের একটি বিবরণ দাও। (Describe the cultural and religious movement in India in the 19th Century.)

পঞ্চদশ অধ্যায়

৭০। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (Discuss the causes and results of the Mutiny of 1857.)

৭১। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ আলোচনা কর। (Discuss the nature and causes of the failure of the Mutiny of 1857.)

বংশ তালিকা

মৌর্যবংশ

চন্দ্রগুপ্ত (প্রিয়দর্শন)
- বিন্দুসার (অমিত্রঘাত)
  - সুসিংহ (সুমান)
    - নিগ্রোধ
  - অশোক (প্রিয়দর্শিন)
    - মহেন্দ্র
    - সংঘমিত্রা
    - চারুমতি
    - কুনাল
      - বন্ধুপালিত (দশরথ ?)
      - সম্প্রতি
        - শালিশূক
        - দেবধর্ম (বর্মন)
        - শবমধন্নুস
        - বৃহদ্রথ
      - বিগতশোক
        - বীরসেন
        - সুভাগসেন (গান্ধার)
    - জলৌক (কাশ্মীর)
    - তিবার
  - বিগতাশোক (তিষা ?)

পুষ্যভূতি বংশ

নরবর্ধন (থানেশ্বর)
- প্রথম রাজ্যবর্ধন
  - আদিত্যবর্ধন
    - প্রভাকরবর্ধন
      - রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়)
      - হর্ষবর্ধন (শীলাদিত্য)
        - কন্যা—দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (ধ্রুবভট্ট বালাদিত্য বলভী)
          - চতুর্থ ধারাসেন (বলভী)
      - রাজ্যশ্রী

গুপ্ত বংশ

- গুপ্ত
  - ঘটোৎকচ
    - প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
      - সমুদ্রগুপ্ত
        - দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
          - গোবিন্দগুপ্ত
          - প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য
            - স্কন্দগুপ্ত
            - পুরগুপ্ত
              - নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য
                - দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
                  - বিষ্ণুগুপ্ত
              - বুধগুপ্ত
            - ঘটোৎকচগুপ্ত (?)
          - প্রভাবতী

সেন বংশ

- বীরসেন
  - সামন্তসেন
    - হেমন্তসেন
      - বিজয়সেন
        - বল্লালসেন
          - লক্ষ্মণসেন
            - বিশ্বরূপসেন
            - কেশবসেন

পালবংশ

- দৈয়িতবিষ্ণু
  - শ্রীব্যাপ্যাত
    - প্রথম গোপাল
      - ধর্মপাল
        - ত্রিভুবনপাল
        - দেবপাল
          - রাজ্যপাল
      - বাকপাল
        - জয়পাল
          - প্রথম বিগ্রহপাল
            - নারায়ণপাল
              - রাজ্যপাল
                - দ্বিতীয় গোপাল
                  - দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
                    - প্রথম মহীপাল
                      - নয়পাল
                        - তৃতীয় বিগ্রহপাল
                          - দ্বিতীয় মহীপাল
                          - দ্বিতীয় সুরপাল
                          - রামপাল
                            - রাজ্যপাল
                            - বিত্তপাল
                            - কুমারপাল
                              - তৃতীয় গোপাল
                            - মদনপাল

দাস বংশ (১২০৬-৯০ খৃঃ)

- (১) কুতুবউদ্দিন আইবক
  - (২) আরাম
  - কন্যা = (৩) ইলতুৎমিস
    - নাসিরউদ্দিন মামুদ (বাংলা)
    - (৪) রুকনউদ্দিন ফিরোজ
      - (৭) আলাউদ্দিন মাসুদ
    - (৫) কন্যা রাজিয়া
    - (৬) মুইজউদ্দিন বাহরাম
    - (৮) নাসিররুদ্দিন মামুদ
      - কন্যা — মহম্মদ
    - কন্যা ? ক্রীতদাস (৯) গিয়াসউদ্দিন বলবন
      - মহম্মদ (স্বামী: কন্যা)
        - (১০) কাইকোবাদ
          - (১১) কায়ুমার্স
      - নাসিরউদ্দিন মহম্মদ বঘরাখাঁ

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খৃঃ)

- (১) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (বলবনের ক্রীতদাস)
  - (২) মহম্মদ তুঘলক (জৌন)
- রাজাব
  - (৩) ফিরোজ শাহ
    - ফতেখাঁ
      - (৪) দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন
    - জাফরখাঁ
      - (৫) আবু বকর
    - (৬) নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহ
      - (৮) নসরতশাহ
      - (৭) আলাউদ্দিন সিকন্দর (হুমায়ুন)
      - (৯) মামুদ শাহ

খল্‌জি বংশ

মুঘলবংশ (১৫২৬-১৮৫৮ খৃঃ)

১। জহীরউদ্দিন বাবর

২। হুমায়ুন কামরান হিন্দল আসকারী

৩। আকবর মীর্জা হাকিম

৪। জাহাঙ্গীর (সেলিম) মুরাদ দানিয়েল

খুসরু পরভেজ ৫। শাহজাহান (খুরম) শারিয়ার

দারাসুকো সুজা ৬। ঔরঙ্গজেব মুরাদ

মহম্মদ সুলতান ৭। মুয়াজ্জম প্রথম শাহ আলম আজম আকবর কামবক্স

বিদর বখত নকুসিয়ার মহীউসসুনত

১০। (খ) তৃতীয় শাহজাহান ১৪ (খ)

৮। জাহান্দার শাহ আজিম-উস-সান রফি-উস-সান জাহান শাহ

৯। মহম্মদ ফরুকসিয়ার

১৪। (ক) দ্বিতীয় আলমগীর

১৫। (ক) দ্বিতীয় শাহ আলম

১৬। দ্বিতীয় আকবর শাহ

১৭। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

১২। (ক) মহম্মদ শাহ

১৩। আহম্মদ শাহ

১৫। (খ) বিদর বখত

১২। (খ) মহম্মদ ইব্রাহিম ১১। রফি-উদ-দৌলা (দ্বিতীয় শাহজাহান) ১০ (ক) রফি-উদ দরাজাত

ভোঁসলে—ছত্রপতি বংশ

- মালোজী
  - শাহজী
- দেবগিরির যাদববংশ
  - লুখজী যাদব
    - জীজাবাঈ

জীজাবাঈ = শাহজী = তুকাবাঈ

- তুকাবাঈ → ভ্যাংকোজী
- জীজাবাঈ →
  - শম্ভুজী
  - সইবাঈ = প্রথম শিবাজী = সয়রাবাঈ
    - সইবাঈ → যেসুবাঈ = প্রথম শম্ভুজী
      - প্রথম শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী)
        - রামরাজা
          - দ্বিতীয় শাহু
            - প্রতাপসিংহ
            - শাহজী রাজা
    - সয়রাবাঈ → তারাবাই = রাজারাম = রাজসবাঈ
      - তারাবাই → তৃতীয় শিবাজী
        - রামরাজা
      - রাজসবাঈ → দ্বিতীয় শম্ভুজী (কোলাপুর)
        - চতুর্থ শিবাজী
          - শম্ভু
          - শাহজী
            - পঞ্চম শিবাজী
              - দ্বিতীয় রাজারাম
                - ষষ্ঠ শিবাজী
                  - শাহু ছত্রপতি

বাংলার নবাব বংশ

মুর্শিদ কুলি জাফর খান
(১৭০৩-২৭)

কন্যা—সুজাউদ্দিন
(১৭২৭-৩৯)

সরফরাজ খান
(১৭৩৯-৪০)

(মীর্জা মহম্মদ, ভাগ্যান্বেষী তুর্কী)

আলিবর্দী খান
(১৭৪০-৫৬)

হাজি আহম্মদ

কন্যা আমিনাবেগম — জৈনুদ্দিন

সিরাজউদ্দৌলা
(১৭৫৬-৫৭)

*　*　*

মীরজাফর
(১৭৫৭-৬০)
(১৭৬৩-৬৫)

কন্যা ফতেমাবেগম-মীরকাশিম
(১৭৬০-৬৩)

নাজিমউদ্দৌলা
(১৭৬৫-৬৬)

সইফুদ্দৌলা
(১৭৬৬-৭০)

খল্‌জি বংশ (১২৯০ ১৩২০ খৃঃ)

কাইম খাঁ

মালবের খল্‌জিগণ (১) জালালউদ্দিন ফিরোজ শিহাবউদ্দিন মাসুদ

(২) রুকনউদ্দিন ইব্রাহিম (৩) আলাউদ্দিন

খিজির খাঁ (৪) শিহাবউদ্দিন উমর (৫) কুতুবউদ্দিন মোবারক

(৬) খসরু (শাসনক্ষমতা দখল করেন)

পেশোয়াবংশ

বিশ্বনাথ

১। বালাজী বিশ্বনাথ

২। প্রথম বাজীরাও চিম্নাজী আপ্পা

৩। বালাজী বাজীরাও ৬। রঘুনাথরাও

বিশ্বাসরাও ৪। মাধবরাও ৫। নারায়ণরাও

৭। মাধবরাও নারায়ণ

অমৃতরাও ৯। দ্বিতীয় বাজীরাও ৮। চিম্নাজী আপ্পা

বিনায়করাও নানাসাহেব